প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ কলেজ রো
কলিকাতা - ৯

প্রথম প্রকাশ : ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫০

মুদ্রাকর :
শ্রীকৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ৯

পৃথিবীর নানা দেশের কথা ও নাট্য-সাহিত্যে এমন অনেক বই আছে যাদের আবেদন বহু শতবর্ষ পরেও আজো সারা বিশ্বের মানুষকে আনন্দ দেয়, প্রেরণা দেয়। দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে যারা কালজয়ী সাহিত্যরূপে স্বীকৃত।

ভারতের এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের এমনি কয়েকটি রচনার সংক্ষেপিত রূপ এই গ্রন্থে বিধৃত।

মূল রচনার বিন্যাসের কারুকর্ম বা লিপি-চাতুর্য এই কাহিনীগুলিতে প্রায়শই নেই, থাকা সম্ভবও নয়। তাহলেও ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং চরিত্রাবলীর রেখাচিত্র পাঠকদের আনন্দ দেবে বলেই মনে করি। এই সংক্ষেপিত কাহিনীগুলি পড়ে পাঠক যদি মূল গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ বোধ করেন, তাহলে এই গ্রন্থ রচনা সার্থক হবে।

কাহিনীগুলি ছদ্মনামে "গল্পভারতী"তে প্রকাশিত হয়েছে।

৯, ডাঃ বিপিনবিহারী স্ট্রীট,
কলিকাতা - ৫

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

॥ এই লেখকের অন্যান্য কয়েকখানা বই ॥

হে মহাজীবন—মনীষীদের জীবনের গল্প

যাত্রা হোল শুরু—উপন্যাস (চলচ্চিত্রে রূপায়িত)

বীরবলের কাহিনী—আকবরের সভার মধ্যমণি বীরবলের বুদ্ধিমত্তা ও রস-রসিকতার কাহিনী

চির মুসাফির—চার্লি চ্যাপলিনের জীবনের চমকপ্রদ সব কাহিনী

আগুনের পরশমণি—উপন্যাস

তিন সর্গ—তিনটি বিখ্যাত বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ

কার্নিভালে খুন—রহস্য কাহিনী

আনন্দমঠ

[সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু অবিস্মরণীয় সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে "আনন্দমঠ" নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই উপন্যাসে মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে, মানুষকে মহৎ প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করতে বঙ্কিমচন্দ্র যে মহত্তম রচনা-শৈলীর স্বাক্ষর রেখেছেন তা বাংলা-সাহিত্যে তুলনাহীন। আনন্দমঠের "বন্দে মাতরম্" আজ ভারতের অন্যতম জাতীয়-সঙ্গীত। বন্দে মাতরম্ কণ্ঠে নিয়ে বাংলার বহু বিপ্লবী বীর শহীদ হয়েছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র ছিল এই বন্দে মাতরম্। এই যাদুমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল একদিন আসমুদ্র হিমাচলের প্রতিটি ভারতবাসী।]

॥ এক ॥

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১১৭৬ সালে এই মন্বন্তর ঘটেছিল এবং তাতে হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। বহু গ্রাম অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। দেশের দিকে দিকে বুকফাটা হাহাকার উঠেছিল।

পদচিহ্ন গ্রামের ধনী জমিদার মহেন্দ্র সিংহ। কিন্তু এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তিনিও আজ নিঃসহায়। বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন যারা ছিল তারা কতক মাঁরা গেছে। অবশিষ্ট সকলে পালিয়েছে। ঝি-চাকর সব চলে গেছে। বিরাট বাড়ির মধ্যে তিনি তাঁর স্ত্রী কল্যাণী এবং শিশুকন্যা সুকুমারী ছাড়া আর কেউ নেই।

মহেন্দ্র ভাবছিলেন, অতঃপর কি করা যায়?

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন— অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রাম ছেড়ে রাজধানীতে না গেলে প্রাণ বাঁচানো যাবে না।

পরদিন স্ত্রী-কন্যার হাত ধরে মহেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে নিলেন কিছু টাকা এবং বন্দুক ও গুলিবারুদ। কল্যাণী সঙ্গে নিলেন একটি ছোট বিষের কৌটো—বিপদের সময় নারীর শেষ আশ্রয়।

সন্ধ্যার আগে তাঁরা একটি চটিতে গিয়ে পৌঁছোলেন।

কিন্তু চটি শূন্য। লোকজন কেউ নেই।

মহেন্দ্র স্ত্রীকে বললেন, তুমি একটু সাহস করে মেয়েকে নিয়ে থাকো, আমি দুধের জোগাড় দেখি। দুধ না পেলে মেয়েটা মারা যাবে।

মহেন্দ্র বেরিয়ে গেলেন।

একা একা কল্যাণীর বড় ভয় করতে লাগল।

দরজা জানলা বন্ধ করবেন তার উপায় নেই। কোন দরজা জানলারই কপাট নেই।

কিছুক্ষণ কাটল।

তারপর সভয়ে কল্যাণী দেখলেন, সামনের দরজার দিকটায় কার ছায়া মূর্ত্তি!

দেখতে দেখতে একে একে অনেকগুলো প্রেতের মতো মানুষ ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। কল্যাণী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হলেন। তখন সেই কালো মূর্তিগুলো তাঁকে এবং সুকুমারীকে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র দুধ নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কোথায় কল্যাণী? কোথায় সুকুমারী?

এদিকে সেই দস্যুরা বনের এক স্থানে গিয়ে কল্যাণী ও সুকুমারীকে নামাল। কল্যাণীর কাছে যেসব গয়নাগাঁটি ছিল, সেগুলো তারা আগেই কেড়ে নিয়েছিল। এখন সেগুলোর ভাগ বাঁটোয়ারা করতে বসল।

একজন ডাকাত একটা গয়না নিয়ে সর্দ্দারের গায়ে ছুঁড়ে মেরে বললে, সোনারূপো নিয়ে কি করব? ক্ষিদেয় প্রাণ যায়। চাল দাও। খেতে দাও।

তখন অন্য সকলেও সেই সুরে চেঁচাতে লাগল এবং ক্ষেপে উঠে সর্দ্দারকে প্রহার করতে শুরু করল। ঘায়ের চোটে অনাহারক্লিষ্ট দলপতি মরে গেল।

একজন ডাকাত বললে, শেয়াল কুকুরের মাংস খেয়েছি, এসো সবাই আজ এই ব্যাটাকে খাই।

আর একজন বললে, বুড়োর মাংস খেয়ে কি হবে? তার চেয়ে এসো ঐ কচি মেয়েটাকে পুড়িয়ে খাই!

তার কথায় অন্য সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বম্‌কালী! আজ নরমাংস খাব।

কিন্তু কোথায় সেই শিশু বা তার মা? তারা নেই।

ডাকাতরা যখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করছিল তখন সেই সুযোগে কল্যাণী মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্ধকারে অপরিচিত পথে বেশিদূর যেতে পারলেন না। পদে পদে হোঁচট খেতে লাগলেন।

পিছনে "ধর, ধর" শব্দ। ডাকাতরা ছুটে আসছে।

কল্যাণী হতাশ হয়ে মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

হঠাৎ দূর থেকে যেন স্বর্গীয় সংগীতের সুর ভেসে এলো—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

আচ্ছন্নের মতো চোখ মেলে কল্যাণী দেখলেন, তাঁর সামনে শুভ্রকেশ এক ঋষিমূর্তি।

তাঁকে প্রণাম করতে গিয়ে আবার চেতনা হারালেন।

জ্ঞান হবার পর কল্যাণী দেখলেন, তিনি একটি পাকা ঘরের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবকান্তি মহাপুরুষ।

মহাপুরুষ বললেন, মা, এ দেবতার ঠাঁই। ভয় কোরো না। মেয়েকে কিছু খাওয়াও। নিজে কিছু খাও।

কল্যাণী সুকুমারীকে দুধ খাওয়ালেন। কিন্তু নিজে কিছু খেলেন না। শুধু কলসী থেকে জল নিয়ে মহাপুরুষের পায়ে ঠেকিয়ে পান করে বললেন, বাবা, এই আমি অমৃত পান করলাম। স্বামীর খবর না পাওয়া পর্যন্ত আর কিছু খাবো না।

মহাপুরুষ কল্যাণীকে আশ্বস্ত করে মহেন্দ্র সিংহের সন্ধানে বেরোলেন।

॥ দুই ॥

চটিতে স্ত্রী-কন্যাকে না পেয়ে মহেন্দ্র নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

স্থির করলেন সেখানে গিয়ে রাজকর্মচারীদের সাহায্যে স্ত্রী-কন্যার খোঁজ করবেন।

কিছুদূর পথ চলার পর মহেন্দ্র দেখলেন, কতকগুলি গরুরগাড়ি চলেছে। সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র সেপাই।

তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তারা খাজনার টাকা নিয়ে চলেছে।

ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তারা এইভাবে নানা জায়গা থেকে খাজনা আদায় করে কলকাতায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

মহেন্দ্রকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে সেপাইরা ভাবল, তিনি একজন ডাকাত।

তারা তাঁকে বেঁধে গরুর গাড়িতে তুললো। স্ত্রী-কন্যার শোকে মহেন্দ্র অত্যন্ত কাতর হোয়ে পড়েছিলেন। তাই বিশেষ বাধা দিতে পারলেন না। নিরুপায় হোয়ে নির্জীবের মতো গাড়ির মধ্যে পড়ে রইলেন।

কিছুদূর গিয়ে সিপাইরা দেখল, পথের উপর একজন গেরুয়াধারী লোক। তারা ভাবল এও একজন ডাকাত। তাকেও ধরে হাত পা বেঁধে তারা গাড়িতে উঠিয়ে মহেন্দ্র সিংহের পাশে ঠেলে দিলে।

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর নাম ভবানন্দ, মহাপুরুষের নির্দেশে তিনি মহেন্দ্রকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

গাড়ি চলতে লাগল। একসময় ভবানন্দ মহেন্দ্রের কানে কানে বললেন, মহেন্দ্র সিংহ, তোমাকে আমি চিনি। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যেই এসেছি। যা বলি সাবধানে তাই কর। তোমার হাতের বাঁধনটা চাকার ওপর রাখ।

বিস্মিত মহেন্দ্র সন্ন্যাসীর কথামত কাজ করলেন। চাকার ঘর্ষণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দড়ির বাঁধন কেটে গেল।

সন্ন্যাসীও সেইভাবে নিজের বন্ধন কেটে ফেললেন।

গাড়িগুলো তখন একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ কাটল। তারপর, হঠাৎ 'হরি হরি' ধ্বনি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'শো অস্ত্রধারী লোক ছুটে এসে গাড়িগুলোকে ঘিরে ফেলল।

যুদ্ধ বেধে গেল। হঠাৎ সেপাইদের সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষ তরবারির আঘাতে প্রাণ হারালো। তাই দেখে সেপাইরা প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিলে। খাজনার টাকা ভর্তি থলেগুলো নিয়ে সেই দু'শো লোক মুহূর্তের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত অন্তরে মহেন্দ্র এই কাণ্ড দেখলেন। ভাবলেন এরা সব ডাকাত!

ভবানন্দ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এইবার আমার সঙ্গে চল। তোমার স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে পাবে।

দু'জনে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

আকাশ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত।

কিছুদূর গিয়ে ভবানন্দ গান শুরু করলেন—

বন্দেমাতরম্!
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

গান থামল। মহেন্দ্র বললেন, এতো দেশ। এতো মা নয়।

ভবানন্দ বললেন, আমরা অন্য মা জানি না, মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমাদের মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী-পুত্র নেই, বাড়িঘর নেই। আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি। এই বলে আবার গাইতে শুরু করলেন:

শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম
সুখদাং বরদাং মাতরম।

সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃত খর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিনীং মাতরম।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণা শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণীং
কমলা কমলদল বিহারিণীং
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে-মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম
ধরণীং ভরণীং মাতরম।

॥ তিন ॥

ভবানন্দ মহেন্দ্রকে সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল আনন্দমঠে নিয়ে গেলেন।

সেখানকার সর্বাধিনায়ক স্বামী সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, চল, তোমাকে তোমার স্ত্রীকন্যার কাছে পৌঁছে দি। তার আগে এসো আমার সঙ্গে।

সত্যানন্দের পিছনে পিছনে মহেন্দ্র মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বিস্ময়ভরা চোখে দেখলেন, সামনে এক অপরূপ জগদ্ধাত্রী মূর্তি।

মহেন্দ্র সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ?

সত্যানন্দ বললেন, মা যা ছিলেন। অর্থাৎ দেশমাতার অতীত রূপ।

আর এক ঘরে গিয়ে মহেন্দ্র দেখলেন—কালী মূর্তি।

সত্যানন্দ বললেন, দেখ, মা যা হয়েছেন। অর্থাৎ দেশমাতৃকার বর্তমান রূপ। তিনি আজ হৃতসর্বস্বা। তাই কালী নগ্নিকা, বস্ত্রহীনা। দেশ আজ শশ্মান, তাই মা কংকালের মালা পরেছেন।

আর একটি ঘরে গিয়ে মহেন্দ্র দেখলেন, সোনার দশভূজা মূর্তি।

সত্যানন্দ বললেন, মার ভবিষ্যৎ রূপ। অদূর ভবিষ্যতে অত্যাচার-রূপী অসুর ধ্বংস হবে। দেশে লক্ষ্মীর আবির্ভাবে গ্রাম নগর ধনধান্যে পূর্ণ হোয়ে উঠবে। সরস্বতীর কৃপায় মায়ের সন্তানরা শিক্ষিত হবে। কার্তিক দেবেন বলবীর্য। গণেশ দেবেন সিদ্ধি। মাকে প্রণাম কর।

দু'জনে জোড় হাতে প্রণাম করলেন।

তারপর সত্যানন্দ বললেন; মন্দিরের বাইরে গেলেই তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখতে পাবে। যাও।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দেখে প্রথমে খুব খানিকটা কাঁদলেন। তারপর সত্যানন্দের দেওয়া প্রসাদ নিয়ে বনের বাইরে একটি নদীর ধারে গিয়ে বসলেন।

মহেন্দ্র কল্যাণীকে জানালেন, কল্যাণী ও সুকুমারীকে বাড়ীতে রেখে তিনি আনন্দমঠে যোগ দেবেন, সন্তানদলে ভর্তি হবেন।

মনে মনে দারুণ বিহ্বল হোলেও কল্যাণী বললেন, স্বামীর ইচ্ছায় তিনি বাধা দেবেন না।

দু'জনে কথাবার্তা বলছেন, তার ফাঁকে সুকুমারী কল্যাণীর অগোচরে তাঁর বিষের কৌটাটি নিয়ে খেলা করতে করতে সেটা খুলে ফেলে তার ভিতরকার বিষের বড়িটা বার করে মুখে পুরে দিলে।

হঠাৎ তার মুখের একটা অস্ফুট শব্দ শুনে কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে দেখেই আর্তনাদ করে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি কন্যার মুখ থেকে বড়িটা বার করলেন বটে কিন্তু বিষের ক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে সুকুমারী নেতিয়ে পড়ল।

তাই দেখে কল্যাণী হাহাকার করে অবশিষ্ট বড়িটা মুখে পুরে গিলে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। স্ত্রী-কন্যার অবস্থা দেখে হতচকিত মহেন্দ্র আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সেই সময় সত্যানন্দ সেখানে এসে ভূলুণ্ঠিত মহেন্দ্রের মাথা কোলে নিয়ে বসলেন। এবং গান গাইতে লাগলেন—

হরে মুরারে, মধুকৈটভারে ···

এমন সময়ে সেখানে একদল সেপাই এসে উপস্থিত হল।

তারা সরকারের আদেশে ডাকাতদের খোঁজে বেরিয়েছিল।

রাজস্বের টাকা লুঠ! রাজধানীতে তাই নিয়ে হুলুস্থূল পড়ে গিছল।

সরকার খবর পেয়েছিল, একদল সন্ন্যাসী সেই টাকা লুঠ করেছে। অতএব রাজার পাইক বরকন্দাজ সন্ন্যাসীদের তল্লাসে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিল।

এমনি একদল সেপাই সেই জায়গায় এসে সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে দেখে ভাবল, এই সন্ন্যাসী হচ্ছে একজন ডাকাত এবং অন্যজন তার অনুচর।

এই ভেবে তারা সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে ধরে নিয়ে নগরের ফাটকে আবদ্ধ করল।

মহেন্দ্র তখনো স্ত্রী-কন্যার শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে আছেন দেখে সত্যানন্দ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সন্তানরা যা করবার তা করবে। আজ রাত্রেই আমরা কারাগার থেকে মুক্ত হব।

॥ চার ॥

সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে সেপাইরা যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সত্যানন্দ গান গাইছিলেন :

ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্ধর গমন বিলম্বন, অতি বিধুরা সুকুমারী।

অদূরে এক গুপ্তস্থানে দাঁড়িয়ে জীবানন্দ সেই গান শুনে তার সংকেত বুঝতে পারলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নদীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কিছুদূর গিয়ে কল্যাণী ও সুকুমারীকে দেখতে পেলেন।

এ কী! মা মরে গেছে। কিন্তু মেয়েটি বেঁচে আছে! জীবানন্দ মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী ভৈরবপুর গ্রামের একটি ছোট বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

এই বাড়ীতে থাকে তাঁর ছোট বোন নিমাইমনি। আর থাকেন তাঁর স্ত্রী শান্তি।

জীবানন্দ সুকুমারীকে নিমাইমণির কোলে তুলে দিলেন। তারপর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল এবং অনেক কথাবার্তা হল।

দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা একান্ত নিষিদ্ধ। সেই ব্রত ভঙ্গ হলে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত—মৃত্যু!

শান্তির দুঃখ দেখে জীবানন্দ একবার ভাবলেন, আর আনন্দ মঠে ফিরে যাবেন না।

কিন্তু শান্তি বললেন, তা হয় না। তুমি তোমার বীরধর্ম কখনো পরিত্যাগ কোরো না।

শান্তির কথায় জীবানন্দের চমক ভাঙল। তিনি আনন্দমঠে ফিরে চললেন।

এদিকে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অপর এক নায়ক ভবানন্দ ঘোড়ায় চড়ে সত্যানন্দের খোঁজে নদীতীর দিয়ে যাবার সময় কল্যাণীর অচেতন দেহ দেখে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

পরীক্ষা করে তাঁর মনে হল এখনো হয়ত এই রমণীকে বাঁচানো যেতে পারে।

তিনি বনজ পাতার রস কল্যাণীর মুখে দিয়ে অল্পে অল্পে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তারপর সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ ঘোড়ার পিঠে তুলে নগরের দিকে যাত্রা করলেন।

॥ পাঁচ ॥

সন্তান সম্প্রদায় জানতে পারল, সত্যানন্দ আর মহেন্দ্র নগরের কারাগারে বন্দী।

সেই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সন্তান আনন্দমঠে উপস্থিত হল এবং সেই রাত্রেই তারা কারাগার আক্রমণ করল।

কয়েদখানা ভেঙে রক্ষীদের মেরে সন্তানদল সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রকে বার করে এনে সানন্দে নৃত্য করতে লাগল।

কিন্তু ইংরেজরাও নিশ্চেষ্ট রইল না। কারাগার আক্রমণের খবর পাবা মাত্র তারা একটা কামান সমেত একদল সেপাই পাঠিয়ে দিল।

সন্তানদল তাদের সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত কামানের মুখে হার মেনে পালাতে বাধ্য হল।

পরদিন আনন্দমঠে এক সভা বসল। সেই সভায় সত্যানন্দ সন্তানদের বললেন, তোমরা বীর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু

তোমাদের অস্ত্র চাই। শুধু লাঠিসোঁটা বল্লমে কাজ হবে না। ওদের মত আমাদেরও কামান বন্দুক দরকার। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি তীর্থযাত্রা করব। সেখান থেকে কারিগর পাঠিয়ে দেব। পদচিহ্ন গ্রামে কারখানা বসিয়ে সেইখানে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হবে। মহেন্দ্রের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সেও আজ ব্রত গ্রহণ করবে।

তিনি আরও জানালেন, মহেন্দ্রের সঙ্গে আরও একজন নবাগত তরুণকে তিনি দীক্ষা দেবেন।

তিনি তাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, যুবকটি খাঁটি সোনা।

এই তরুণ যুবা ছদ্মবেশে জীবানন্দের স্ত্রী—শান্তি।

স্বামী চলে আসবার পর তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য—স্বামীর সঙ্গে থেকে তাঁর ব্রতে সহায়তা করা।

যথারীতি মহেন্দ্র এবং শান্তির দীক্ষা হল।

শান্তির নতুন নাম হল—নবীনানন্দ।

দীক্ষার পর সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বললেন, এইবার আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ কর। পদচিহ্নে গিয়ে দুর্গ তৈরী কর। সেখানে কামান বন্দুক তৈরী হবে, আর সন্তানদের অর্থভাণ্ডারও সেইখানে থাকবে।

মহেন্দ্র স্বীকৃত হয়ে প্রস্থান করলেন।

অন্য সকলে যে যার কাজে চলে গেল। তখন সত্যানন্দ শান্তিকে কাছে ডেকে বললেন, ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা!

শান্তি বললেন, প্রভু, এমন দোষই বা কি করেছি। স্ত্রীলোকের বাহুতে কি শক্তি থাকে না?

সত্যানন্দ বললেন, তাই নাকি! আচ্ছা, পরীক্ষা দাও তো দেখি।

তিনি শান্তিকে একটি ইস্পাতের ধনুক এবং লোহার তীর দিয়ে বললেন, এই ধনুকে গুণ দাও, তোমার শক্তি দেখি।

শান্তি অবলীলাক্রমে ধনুকে শর যোজনা করে গুণ দিলেন।

সত্যানন্দ বিস্ময়ে নির্বাক!

এই কঠিন পরীক্ষায় এর আগে মাত্র চারজন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নিজে, ভবানন্দ এবং জীবানন্দ আর জ্ঞানানন্দ।

শান্তি আনন্দমঠে থাকবার অনুমতি পেলেন।

॥ ছয় ॥

মন্বন্তর শেষ হল। দেশ শস্যশালিনী হল। কিন্তু দেশে অরাজকতা কমল না।

এদিকে সন্তানসেনা দিন দিন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

একাধিকবার তারা সরকারী টাকা লুঠ করল। অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ তাদের হাতে লাঞ্ছিত হল। তাদের খবর ইংলণ্ড পর্যন্ত পেঁ ৗছলো।

তখন এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কৃতসংকল্প হয়ে ক্যাপ্টেন টমাসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য নিযুক্ত করলেন।

কয়েকবার সন্তানদলের সঙ্গে ক্যাপ্টেন টমাসের সংঘর্ষ হল।

সেইসব লড়াইয়ে প্রতিবারই সন্তানসেনা জয়লাভ করল বটে, কিন্তু অনেক সন্তান মারাও পড়ল।

সত্যানন্দ মঠে ফিরে এলেন।

সমবেত হাজার হাজার সন্তানদের সম্বোধন করে বললেন, হে বীর সন্তানবৃন্দ, ক্যাপ্টেন টমাস আমাদের বহু সন্তানকে মেরেছে। আজ রাত্রে আমরা তাকে সসৈন্যে বধ করব। পদচিহ্ন দুর্গ থেকে সতেরোটা কামান আসছে। কামান এসে পেঁ ৗছলেই আমরা যুদ্ধযাত্রা করব।

কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন টমাস আনন্দমঠ আক্রমণ করল।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সন্তানসেনা প্রথমটা হতবুদ্ধি হল।

ইংরেজের তোপ গর্জন করতে লাগল। সহসা সমূহ বিপদ ঘনিয়ে উঠল।

তখন সত্যানন্দের নির্দেশে জীবানন্দ দশ হাজার সন্তান নিয়ে মরণ-পণ করে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল।

ভবানন্দের রণ-কৌশলে ক্যাপ্টেন টমাস বন্দী হল বটে, কিন্তু অপর দুই ইংরেজ অধিনায়ক ক্যাপ্টেন হে ও লেফটেনান্ট ওয়াট্‌সন মুহুর্মুহু কামান দেগে সন্তানদলকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল।

এমন সময়ে দুই দলকে চকিত করে দূরে কামান গর্জন করে উঠল।

দ্রুম্, দ্রুম্, দ্রুম্।

দেখতে দেখতে ইংরাজ সেনাদলের উপর সেই কামান থেকে অগ্নিবৃষ্টি হতে লাগল।

সতেরোটা কামান নিয়ে মহেন্দ্র এসে পৌঁছেছেন।

সেই কামান গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত হল। ইংরেজদল ভয়ে চোখ বুজল।

সন্তানসেনা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দ্বিগুণ তেজে ইংরাজদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত শত ইংরাজ সৈন্য মরতে লাগল।

তখন হে আর ওয়াট্‌সন হার স্বীকার করে বলে পাঠাল, আমরা তোমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করছি। আর হত্যা করো না।

জীবানন্দ এবং ধীরানন্দ যুদ্ধ থামাতে সম্মত হলেন, কিন্তু ভবানন্দ রাজী হলেন না।

আজ তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতেই হবে। কারণ তিনি সন্তানদের ব্রত ভঙ্গ করেছেন। কল্যাণীকে তিনি গৌরী দেবী নামে এক পরিচিতা বৃদ্ধার বাড়ীতে রেখে এসেছেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

সন্তানদের পক্ষে এ যে মহাপাপ! ভবানন্দ মনে করলেন, এই ব্রতভঙ্গের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। মৃত্যু ছাড়া তাঁর আর অন্য গতি নেই। তিনি একা অবশিষ্ট ইংরাজ সেনার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

॥ সাত ॥

যুদ্ধ জয়ের আনন্দের মধ্যেও বিষাদ।

ভবানন্দের সঙ্গে আরও অনেক বীর সন্তান প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রধান সন্তানদের একত্রিত করে সত্যানন্দ বললেন, আমাদের ব্রত সফল হোয়েছে। নগর ছাড়া সমস্ত বীরভূম আমাদের অধিকারে। তোমরা এখানে সন্তানরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কর। প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় কর।

তারপর মহেন্দ্রকে ডেকে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি তোমার কাজ করেছ। এবার তুমি সংসারী হোতে পারো।

মহেন্দ্র কেঁদে বললেন, ঠাকুর কাকে নিয়ে সংসারী হব? আমার স্ত্রী-কন্যা নেই। আমার কেউ নেই।

সত্যানন্দ বললেন, তোমার সব আছে মহেন্দ্র। আমি নবীনানন্দকে নির্দেশ দিয়েছি। সে তোমাকে তোমার স্ত্রী-কন্যার কাছে নিয়ে যাবে।

অতঃপর শান্তির মাধ্যমে মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শান্তির প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

কল্যাণী আগেই জেনেছিলেন, এখন মহেন্দ্রও জানলেন, নবীনানন্দ শান্তির ছদ্মবেশ এবং তিনি জীবানন্দের ধর্মপত্নী।

॥ আট ॥

এবার সন্তান দমনে এলো এক নতুন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ। তার নাম মেজর এডওয়ার্ডস্।

সন্ধান নিয়ে মেজর এডওয়ার্ডস্ জানতে পারল, পদচিহ্নই সন্তানদের দুর্গ। সেখানেই তাদের অস্ত্রাগার এবং ধনাগার।

এডওয়ার্ডস্ স্থির করল, সর্বাগ্রে পদচিহ্ন দখল করতে হবে।

সেই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার জন্যে চতুর এডওয়ার্ডস এক ফন্দী আঁটল। রটনা করে দিল, মাঘীপূর্ণিমার দিন নদীতীরে যে মস্ত মেলা বসবে সেই মেলা সে আক্রমণ করবে।

কিন্তু তার আসল মতলব ছিল ভিন্ন।

সন্তানগণ নিশ্চয় মেলায় আসবে। পদচিহ্ন দুর্গ প্রায় অরক্ষিত থাকবে। সেই সুযোগে সে মেলা আক্রমণ না করে পদচিহ্ন দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করবে।

মাঘী পূর্ণিমার দিন শান্তির সাহস আর কৌশলে খবর পাওয়া গেল ইংরাজ সৈন্য পদচিহ্ন অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে একটা টিলার পাশে মহেন্দ্র শিবির স্থাপন করলেন।

টিলার ওধারে ইংরাজ সৈন্য।

যে আগে টিলার উপর উঠতে পারবে তারই জয় হবে।

তখন সেই টিলার অধিকার নিয়ে তুমুল যুদ্ধ হোতে লাগল।

ইংরাজ সৈন্য আগে টিলার উপর উঠে পড়ল এবং উপর থেকে কামান দেগে শত শত সন্তানকে হতাহত করতে লাগল। তখন জীবানন্দ নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও ঘোড়া ছুটিয়ে শত্রুর কামান কাড়বার জন্যে অগ্রসর হলেন।

এমন সময় পঁচিশ হাজার সন্তানসেনা নিয়ে সত্যানন্দ পিছন থেকে ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করলেন।

তা দেখে মহেন্দ্রের সন্তানসৈন্যও উৎসাহিত হোয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে ইংরাজ সৈন্য নিঃশেষে সাবাড় হয়ে গেল।

কলকাতায় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাছে খবর নিয়ে যায় এমন একজনও অবশিষ্ট রইল না।

॥ নয় ॥

নিস্তব্ধ নির্জন রণক্ষেত্র পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় প্লাবিত।

চতুর্দিকে হতাহত ইংরাজ ও সন্তানসেনা পড়ে আছে।

তারই মাঝে একাকিনী শান্তি জীবানন্দের দেহ খুঁজছিলেন।

অনেক খুঁজেও যখন পেলেন না তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় এক জটাজুটধারী মহাপুরুষ এসে সস্নেহে শান্তিকে বললেন, মা, ওঠো, কেঁদো না। তোমার স্বামীর দেহ আমি খুঁজে দিচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে।

সেই মহাপুরুষ শুধু যে জীবানন্দের দেহ খুঁজে বার করলেন তাই নয়, বন্য লতাপাতার ওষুধ দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন।

জীবানন্দ চোখ মেলে শান্তিকে দেখলেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষকে দেখতে পেলেন না। তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন।

তখন শান্তি আর জীবানন্দ দু'জনে হাত ধরাধরি করে সেই অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে মিলিয়ে গেলেন।

*　　*　　*

রণক্ষেত্র থেকে মহাপুরুষ এলেন আনন্দমঠে।

সত্যানন্দ পরম ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন।

মহাপুরুষ বললেন, সত্যানন্দ, তোমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এখন ইংরাজ দেশ শাসন করবে। তারাই রাজা হবে। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল।

সত্যানন্দ দুঃখ করে বললেন, হায় মা, শেষ পর্যন্ত তোমায় উদ্ধার করতে পারলাম না।

মহাপুরুষ বললেন, সত্যানন্দ, কাতর হ'য়ো না। এখনো সময় আসেনি। এখনো দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার হয়নি। অতঃপর শিক্ষার ফলে দেশের মানুষের জ্ঞান বাড়বে। তখন আবার দেশ জেগে উঠবে। তোমার এখানে আর কোন কাজ নেই। তুমি আমার সঙ্গে হিমালয়ের মাতৃমন্দিরে চল। সেখানে তোমার জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হবে।

এই বলে মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরলেন। তারপর দু'জনে চলতে লাগলেন।

চাঁদ সদাগর

[দেশবিদেশের চিরকালীন আবেদন-সমৃদ্ধ বিখ্যাত কাহিনীগুলির সংক্ষেপিতরূপ তুলে ধরবার কাজে মনে হল, বাংলার প্রাচীন সাহিত্যেও এমন সব কাহিনী আছে যা আজো মানুষের মনকে আকৃষ্ট আবিষ্ট করে। সেই কাহিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়াও আজকের পাঠক পাঠিকার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কেননা তাদের মধ্যে শুধু যে উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর পরিচয় আছে তাই নয়, তাদের মধ্যে আমাদের সমাজের ও আমাদের ঐতিহ্যের নিদর্শনও বিধৃত। সেদিক থেকে কাহিনীগুলির স্বতন্ত্র মূল্যও আছে।

বর্তমান সংখ্যায় পরিবেশিত হ'ল পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যকৃতি মঙ্গলকাব্যের একটি কাহিনী—বিজয় গুপ্ত রচিত মনসা মঙ্গলের উপাখ্যান—চাঁদ সদাগর। একজন স্বাধীনচেতা আদর্শনিষ্ঠ নির্ভীক পুরুষ কেমন করে তাঁর নীতি বজায় রাখবার জন্য ধনজনের মায়া কাটিয়ে দারুণ ঝড়ঝাপটা আর বিপদের মুখেও তাঁর মাথা হেঁট করেন নি—চাঁদ সদাগরের দেবতার বিরুদ্ধে লড়াইএর মধ্যে সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে। বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বিজয় গুপ্ত। পূর্ববঙ্গে এবং আসামে মনসা মঙ্গল কাব্য খুবই প্রচলিত। মনসা মঙ্গলের অন্যান্য রচনাকারও আছেন, যথা, কানা হরিদত্ত, বিপ্রদাস পিপলাই ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।

॥ এক ॥

চম্পকনগরের বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগর আদেশ জারী করলেন, তাঁর রাজ্যে কেউ 'কানী মনসার' পূজো দিতে পারবে না।

এদিকে মনসাও ছলে-বলে-কৌশলে পূজো আদায় করবেনই, কারণ মহাদেব ঘোষণা করে দিয়েছেন চাঁদের হাতে পূজো না পেলে মনসার পূজো চলিতই হবে না। তাই চাঁদে পদ্মায় শুরু হল বিষম বিবাদ।

চাঁদের সাধের সাজানো বাগান মনসার কোপানলে পুড়ে ছাই হোয়ে গেল। একে একে ছ'ছটি সোনার ছেলে সাপের কামড়ে প্রাণ হারালো, ছ'টি সোনার প্রতিমা পুত্রবধূর চোখের জলে চাঁদের অন্তঃপুর প্লাবিত হল। চাঁদের স্ত্রী সনকার বুকফাটা আর্তনাদে দেশের লোক হায় হায় করতে লাগল। কিন্তু চাঁদ সদাগর অটল, অবিচল।

চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরি ওঝা মন্ত্রের জোরে এক নিমেষে মড়া বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন, কিন্তু মনসার চক্রান্তে তিনিও প্রাণ হারিয়েছেন। চাঁদের এক মহাবল ছিল—মহাজ্ঞান নামে মৃত্যুঞ্জয়ী বীজমন্ত্র। কিন্তু মনসা নটির ছদ্মবেশে চাঁদকে ভুলিয়ে সেই মহাজ্ঞান হরণ করে নিয়েছেন, তাঁর ডান হাত ভেঙে গেছে। দুঃখে আর অত্যাচারে চাঁদ সদাগর যেন কঠিন পাষাণ মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন।

সনকা স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছেন, বলেছেন, মনসার মতো প্রবল দেবীর সঙ্গে বিবাদ করে আর সর্বনাশ ডেকে এনো না, মনসার পূজো দাও। কিন্তু চাঁদের ক্রোধ তাতে আরও বেড়েছে। না, হীন শত্রুর সঙ্গে কখনই সন্ধি নয়। শিবভক্ত চাঁদ অধমের এবং অধর্মের পূজো দিতে পারবেন না, ঘরসংসার ছারখার হলেও না। মনসা তো দেবী নয়, কোন উঁচু জাতই তো তার পূজো করে না, দেবত্বের কোন লক্ষণই নেই তার মধ্যে। কোথায় শিব আর কোথায় মনসা!

শিব মঙ্গলময়, শিব শান্ত সুন্দর। আর মনসা! অসুন্দর অমঙ্গলময়! ক্রোধে আর ঘৃণায় চাঁদ লাথি মেরে ভেঙে ফেললেন মনসার ঘট। না, চাঁদের রাজ্যে মনসার স্থান নেই। দেশ-বিদেশের বণিক বন্ধুরা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন, সদুপদেশ দিয়েছেন কিন্তু চাঁদ যেন পাষাণে প্রাণ বেঁধেছেন। নিজের ধর্মকে আর জীবনের আদর্শকে তিনি কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করতে পারেন না।

একদিন চাঁদ সদাগর শুনতে পেলেন, ঝালু মালু জেলে নদীর ধারে

মনসার ঘট পেতে পুজো দিচ্ছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে লাঠি হাতে ধেয়ে গিয়ে মনসার ঘট ভেঙে চুরমার করে ফেললেন। অপমানিত মনসা চাঁদকে হাতে হাতে শিক্ষা দেবার জন্য আহত ফণিনীর মতো ফুঁসতে লাগলেন।

॥ দুই ॥

হঠাৎ চাঁদ সদাগর স্থির করলেন, সমুদ্র যাত্রা করবেন, বিদেশ ভ্রমণ করে প্রাণের জ্বালা জুড়োবেন। রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বিচিত্র পণ্য সম্ভারে মাঝি মাল্লারা সপ্তডিঙা সাজালো। যথাকালে উজান বেয়ে চলল সেই সপ্তডিঙা।

একে একে কত বাঁক পার হয়ে পাল তুলে এগিয়ে চলেছে সপ্তডিঙা—শংখচূড়, উদয়তারা, টিয়াঠুঁটি, আজল-কাজল, আরো কত নাম।

দক্ষিণ দেশে আছে এক রাজ্য। তার রাজা বিক্রমকেশরী। মাঝি মাল্লাদের কাছে চাঁদ শুনলেন, সে দেশে সাগর-তীরে ঢেউ-এ ঢেউ-এ উঠে আসে রাশি রাশি শংখ আর মুক্তা। চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা সেই দেশে গিয়ে ভিড়ল।

রাজার কোতোয়াল এলো। চাঁদ চতুর লোক। পাকা ব্যবসায়ী। পান খাইয়ে কোতোয়ালকে খুশী করলেন। বললেন, তিনি রাজার জন্য অনেক পণ্য এনেছেন।

বিশেষ সমাদরের সঙ্গে কোতোয়াল চাঁদকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। চাঁদ বাকচাতুর্যে রাজাকে খুশী করলেন। পণ্য বিনিময় হল। চাঁদ রাজার কাছ থেকে পেলেন সেই রাজ্যের জিনিষ, গজদন্ত, সোনা,

হরিণ, ময়ূর আর কাকাতুয়া। তার বদলে তিনি দিলেন, মূলো, হলুদ, ছাগল আর পায়রা।

অফুরন্ত বহুমূল্য ভাণ্ডারে ভরে চাঁদ সদাগর সপ্তডিঙা সাজিয়ে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যাত্রার আগে স্নান সেরে পূজোয় বসলেন। পূজোর শেষে দেখেন এক বুড়ী তাঁর কাছে পূজো চাইছে। বলছে, তাকে পূজো না দিলে সব ভরাডুবী হবে। বুড়ীকে মনসা বলে চিনতে পেরেই রাগে আগুন হয়ে চাঁদ তাকে তাড়িয়ে দিলেন।

॥ তিন ॥

ফেরবার পথে চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা কালীদহে পড়ল। অমনি আকাশ কালো করে দিগন্তব্যাপী মেঘ জমা হল। পৃথিবী অন্ধকার হোয়ে গেল। মেঘের গতিক দেখে মাঝি মাল্লাদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারপর ঝড় বইতে লাগল হু হু করে, ছই-এর ঘর উড়ে গেল। প্রলয়ের প্লাবন যেন পৃথিবীকে গ্রাস করল। সপ্তডিঙার গলুই ভেঙে গেল, নৌকাগুলো খান খান হল।

উদ্দাম জলরাশি লক্ষ হাতে করতালি দিচ্ছে। অন্ধকারে ফেনরাশি বিজয়ী শত্রুর মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। মাঝে মাঝে পর্বত প্রমাণ সাপ ফণা তুলে দাঁড়াচ্ছে। চাঁদ সদাগর সেই অকূল সাগরে শিবের নাম কণ্ঠে নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। মনসা এবার চাঁদকে বাগে পেয়েছেন।

অসহায় অবস্থায় চাঁদকে হাতে আনা সহজ হবে মনে করে মনসা বিরাট বিরাট পদ্মপাতা চাঁদের সামনে ভাসিয়ে দিলেন। চাঁদ বহু আশায় হাত বাড়ালেন। কিন্তু মনসার আর এক নাম পদ্মা,

সেকথা মনে পড়তেই ঘৃণায় পাতা সরিয়ে আনলেন, ডুবে মরবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু মনসা তো তাঁকে মরতে দিতে পারেন না। তাহলে তাঁর পূজো চলিত হবে না যে! তাই ডুবে গেলেন না চাঁদ, কোন রকমে প্রাণ নিয়ে এক সমৃদ্ধ পল্লীর তীরে এসে উঠলেন, শ্মশান থেকে একখানা ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করলেন।

সেখানেই ছিল বাল্যবন্ধু চন্দ্রকেতুর বাড়ী। তাঁর কথা মনে হতেই চাঁদ তাঁর বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

বন্ধুর এহেন বিপদ দেখে চন্দ্রকেতু বিষম ব্যথা পেলেন, পরম সমাদরে তাঁকে বাড়ির মধ্যে এনে বহুমূল্য বসন পরতে দিলেন, তারপর তাঁকে পাশে নিয়ে খেতে বসলেন।

তিনদিনের পর সামনে বিরাট ভোজের আয়োজন দেখে চাঁদের রসনা সিক্ত হল। এমন সময় চন্দ্রকেতু বন্ধুকে বললেন, "মনসার সঙ্গে কলহ করে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না ভাই।"

শুনেই চাঁদের খাবার ইচ্ছা চলে গেল, রাগে তাঁর সর্ব শরীর জ্বালা করতে লাগল। না, শত্রুর ভক্তের বাড়ীতে তিনি অন্নজল গ্রহণ করবেন না। উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে। গায়ের বহুমূল্য বসন ফেলে দিলেন। তারপর সেই শ্মশানের ছেঁড়া কানি পরে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধু চন্দ্রকেতু অনেক অনুনয় করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না।

তারপর কয়েক মুঠা চাল ভিক্ষা করে চাঁদ সদাগর বহু আশায় রান্নার জোগাড় করে স্নান করতে গেলেন। কিন্তু মনসা পিছনে লেগেই আছেন। তাই গণেশের বাহন ইঁদুর পাঠিয়ে মনসা সেই কয়েক মুঠা চাল ইঁদুরকে খাইয়ে দিলেন। স্নান করে গিয়ে হাঁড়ি শূন্য দেখে চাঁদ বুঝলেন সব। কিন্তু কোন কথা বললেন না। কঠিন

যন্ত্রণায় শুধু ভ্রুকুটি করে রইলেন। তারপর খিদের জ্বালায় কলার খোসা খেতে লাগলেন।

পথের পাশ দিয়ে একদল কাঠুরে বনে যাচ্ছিল। চাঁদের দশা দেখে তারা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেল। চাঁদ কাঠ চিনতেন, কোন্ কাঠের কত মূল্য, কী কাজ সে বিষয়ে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজেই কতবার চন্দন, সুন্দরী কাঠের বাণিজ্যতরী বিদেশে পাঠিয়েছেন—কাঠ রপ্তানি করেছেন।

চাঁদ বেছে বেছে এক বোঝা চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে কাঠুরেদের সঙ্গে হাটের দিকে চললেন। কিন্তু মনসার ভরে সে বোঝা জগদ্দল পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠল। অনাহারক্লিষ্ট সদাগর সে বোঝা বইতে পারলেন না।

নিরুপায় হোয়ে চাঁদ এক বামুনের বাড়িতে চাকরের কাজ নিলেন। কিন্তু চাকরের কাজ তো কখনো করেন নি, তাই প্রতি পদে ভুল হোতে লাগল। দু' একদিন পরেই মনিব মূর্খ চাকরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে।

চাঁদ সদাগর একটুখানি আশ্রয়ের জন্য দিশাহারার মতো বনে জংগলে ঘুরতে লাগলেন।

রাত হয়ে এলো। নিবিড় বনে অন্ধকারের বিভীষিকা। হিংস্র জানোয়ারের বিকট চিৎকার। তারই মাঝখানে পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন চাঁদ সদাগর। উর্ধ্বনেত্রে বললেন, "হে শিবশংকর, কোন অত্যাচারেই যেন অন্যায়ের কাছে, অধর্মের কাছে, হীনতার কাছে মাথা হেঁট না করি। যতদিন বাঁচি, প্রাণের আদর্শকেও যেন বাঁচিয়ে রাখতে পারি। সেই চেষ্টায় যদি মৃত্যু হয় সেও আমার ভাল। মণিময় রাজপ্রাসাদ, প্রিয়জন, রাজসম্পদ কোন কিছুর টানেই যেন আমি ধর্মপথ থেকে ছিটকে না পড়ি।"

॥ চার ॥

অবশেষে চাঁদ সদাগর দেশে ফিরে এলেন। স্বামীর দশা দেখে সনকা কেঁদে সারা হলেন। সদাগর নিজে মুখ ফুটে একটি কথাও বললেন না।

সনকা এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে মনসার পুজো করেছেন, দেবীর কাছে দুঃখের দিনে সান্ত্বনা চেয়েছেন, একটি পুত্র সন্তান কামনা করেছেন। তাঁর কামনা ব্যর্থ হল না। একদিন শুভলগ্নে সদাগরের ঘরে শাঁখ বেজে উঠল, উলুধ্বনি শোনা গেল। সনকার আর একটি ছেলে হল। ছেলের চাঁদমুখ দেখে সনকা সব দুঃখ ভুলে গেলেন। ছেলের নাম হল লক্ষ্মীন্দর। আদরের ডাক-নাম লখাই।

ছেলের মুখ দেখে চাঁদের বুক কেঁপে উঠল। চোখ জলে ভরে গেল। তিনি জানতেন, এ ছেলেকেও রাখতে পারবেন না। তাই মায়ার ফাঁদে পা বাড়ালেন না, লখাই-এর দিকে তাকালেন না। পুত্রের প্রতি পিতার এই অবহেলা দেখে সনকা প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন।

দেখতে দেখতে লখাই বড় হোয়ে উঠল। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিল। সনকার বড় সাধ লক্ষ্মীন্দরের একটি লক্ষ্মী-বৌ ঘরে এনে ঘরে লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়ে তোলেন।

চাঁদের কাছে কথাটা পাড়তেই তিনি শিউরে উঠলেন। মনে পড়ে গেল ভবিষ্যৎ বাণী—"গণকঠাকুর বলেছেন, বাসরঘরে লখাই-এর সর্প দংশনে মৃত্যু হবে।"

চাঁদ চুপ করে রইলেন। তারপর সনকার দুঃখ বুঝে ভাবলেন, মনসা বাদী হলেও বাসরঘরের এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে মনসার জারিজুরি খাটবে না।

চাঁদকে নিয়ে পুরোহিত এল নিছনি নগরে। সায়বেণের মেয়ে বেহুলার রূপগুণের কথা সকলের মুখে মুখে। রান্নাবান্নায়, নাচে-গানে, স্বভাব চরিত্রে বেহুলার মত মেয়ে নেই। কন্যার মুখ দেখে চাঁদের বুক ভরে উঠল। শিবদুর্গা স্মরণ করে তিনি পাকা-দেখা দেখলেন।

মহা ধুমধামে লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে-বাড়িতে কোন বিপদ ঘটল না। চাঁদ সদাগর হিন্তালের বিরাট লাঠি হাতে করে রাত জেগে নিজেই বিবাহ সভা পাহারা দিয়েছেন। বিয়ে হয়ে গেলেই তিনি সায়বেণের দুটি হাত ধরে বললেন—"বেয়াই, ক্ষমা করবেন, মেয়ে-জামাইকে এখন এই রাতেই নিয়ে যাব। সাঁতালী পাহাড়ের চূড়ায় লোহার বাসর তৈরী করে রেখেছি। বাসরঘরে লখাইকে সাপে কাটার ভয় আছে। আমার ছ'টি ছেলে সাপের কামড়েই মারা গেছে। এ বিপদ কেটে গেলে মেয়ে-জামাইকে যতদিন খুশি কাছে রাখবেন।"

এই কথা শুনে বেহুলার মা শিউরে উঠলেন। শিউরে উঠল পুরনারীরা। যাই হোক, সায়বেণে মেয়ে-জামাইকে যাত্রা করিয়ে দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

চাঁদ সদাগর সাঁতালী পর্বতে হিন্তালের লাঠি হাতে লোহার বাসরের দরজায় অতন্দ্র চোখে স্বয়ং পাহারা দিতে লাগলেন। প্রকাণ্ড লোহার ঘর, দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য। চারিদিকে শত শত প্রহরী, হাজার হাজার ময়ূর, লক্ষ লক্ষ নেউল তীক্ষ্ণ নখর মেলে সাপের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লৌহ-বাসরের গায়ে গায়ে বিচিত্র গন্ধযুক্ত লতাপাতা ও শিকড়মূল। তাদের ঝাঁঝালো গন্ধে সাপেরা সব

সাঁতালী পাহাড়ের সীমানা ছেড়ে পালালো। চাঁদ-পদ্মায় বাদ। আজ তারই পরীক্ষার দিন। মনসাও যে-সে দেবী নন, স্বমূর্তিতে কর্মকারকে ভয় দেখিয়ে সেই বাসরে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়ে রেখেছেন।

বাসরঘরে বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর দুজনেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হল। গভীর রাতে হঠাৎ লক্ষ্মীন্দর চিৎকার করে উঠল। দেখলো, কালনাগিনী তাকে কামড়ে দিয়ে ছিদ্রপথে পালাচ্ছে। লক্ষ্মীন্দর কাটারি দিয়ে তার লেজের খানিকটা কেটে ফেলল। তারপর ছটফট করতে করতে মাটিতে ঢলে পড়ল।

বেহুলার কাল-ঘুম এতক্ষণে ভাঙলো। জেগে উঠে স্বামীর অবস্থা দেখে সে আর্তনাদ করে উঠল।

এদিকে ততক্ষণে ভোর হয়েছে সাঁতালী পর্বতে। জামাই বরণ করতে এসে জামাই-এর অবস্থা দেখে বেহুলার মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চাঁদ সদাগরও যেন শোক আর সামলাতে পারলেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপরেই সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

চান্দ বলে প্রিয়া তুমি না কান্দিও আর।
ভাবিয়া দেখগো প্রিয়া সকলি অসার।
মিছামিছি বলি কেন তোমার আমার।
যে দিছিল লক্ষ্মীন্দরে সে নিল আবার॥

অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে চাঁদ সদাগর পুত্রের সৎকারের কাজে মন দিলেন।

তাই দেখে জোড়করে মিনতির সুরে বেহুলা বললে—"বাবা, সৎকারের আয়োজন করবেন না। কলার মান্দাসে করে প্রভুর সঙ্গে আমিও সাগরে ভাসবো, স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়ে তবে ফিরবো।"

সেই মতই ব্যবস্থা হল! সনকার হাহাকারে আকাশ-বাতাস যেন কাঁদতে লাগল। নদীর জল যেন উথলে উঠল।

শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে বেহুলা স্বামীর শবদেহ নিয়ে কলার মান্দাসে উঠে বসল। ভেসে চলল কলার ভেলা। বিদায় দৃশ্য দেখে চাঁদ সদাগরের কঠিন সংযমের বাঁধ মুহূর্তের জন্য ভেঙে পড়ল।

॥ ছয় ॥

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। বেহুলার ভায়েরা নদীকূলে এসে আদরের বোনকে কেঁদে কেঁদে ডাকল।

বেহুলা বললে, "স্বামীর প্রাণ ফিরে পেলে আমিও ফিরবো। স্বামী বিহনে নারীর জীবন কুৎসিত।"

বাঘের বাঁকে আসার পর শব পচতে শুরু হল। বেহুলা দিনরাত জেগে ক্রিমিকীট ছাড়াতে লাগল আর চোখের জলে মা মনসাকে ডাকতে লাগল।

পথে কত রকমের বিপদ ঘনিয়ে এলো। কিন্তু বেহুলা ভয় পেল না। এমনি করে ডোমের ঘাট, ধনা-মনার ঘাট, কত বিপদের ঘাট পেরিয়ে চলল বেহুলার ভেলা।

একে একে সাগরের বুকে ছ' মাস কেটে গেল। তবু বেহুলা মনের বল হারাল না। স্বামীর হাড় ক'খানি বুকে করে ভেসে চলল।

এবারে সামনেই নেতা-ধোপানীর ঘাট। বেহুলা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তার সব কথা শুনে নেতা বেহুলাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গেল।

দেবসভায় এসে গলায় আঁচল দিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালো বেহুলা।

বেহুলার স্বামী ভক্তি দেখে দেবতারা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বেহুলাকে বললেন, "মর্ত্যে তোমার নাম 'বেহুলা নাচুনী'। তুমি আমাদের নাচ দেখিয়ে তৃপ্ত কর।

কঠিন আদেশ। স্বামীকে স্মরণ করে বেহুলা হাসিমুখে নাচ শুরু করল। অপূর্ব সে নৃত্য। দেখে দেবতারা মহা খুশী।

কিন্তু মনসা এলেন না। তখন কার্তিক গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন।

মহাদেব মনসার কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন—"বেহুলার স্বামী তুমি খাইলা কি মতে?"

মনসা প্রথমটা অস্বীকার করার চেষ্টা করলেন। তারপর "হেঁট মাথা পদ্মাবতী রহে অধোমুখী।"

শিব বললেন, "পদ্মা, এবার লক্ষ্মীন্দরকে জিইয়ে দাও।"

কিন্তু মনসা যে চাঁদের হাতে অসহ্য অপমান সহ্য করেছেন তার কি হবে? চাঁদ কি পূজো দেবেন? মনসা কি কম দুঃখে চাঁদের পিছনে লেগেছেন!

মহাদেব আশ্বাস দিলেন, চাঁদ যাতে পূজো দেয় সে ভার তিনি নিজেই নিলেন। বেহুলাও কথা দিল যে তার শ্বশুর পূজো দেবেন।

মনসা তখন লক্ষ্মীন্দরের কংকালে জীবন দান করলেন। বেহুলা তার প্রাণের স্বামীকে ফিরে পেল। কিন্তু ছ'টি জা যে বিধবা রইল। পদ্মা তখন বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দরের মিলন-নৃত্যে খুশি হয়ে একে একে বেহুলার ছয় ভাসুরকে বাঁচিয়ে দিলেন। ফিরিয়ে দিলেন সপ্তডিঙা। ধন্বন্তরী ওঝাও বেঁচে উঠলেন মনসার দয়ায়।

॥ সাত ॥

ধনেজনে পূর্ণ হয়ে সপ্তডিঙা চম্পকনগরে নদীর কূলে এসে ভিড়ল। ছুটতে ছুটতে সবাই গিয়ে চাঁদকে সেকথা জানাল। বরণকুলো মাথায় করে সনকা ঘাটে এলেন, ছয় বৌ এলো। মনের আনন্দে আজ আর কারো লাজ-লজ্জা নেই। নদীর কূলে সমস্ত নগর এসে যেন ভেঙে পড়ল।

হারানো সাত ছেলেকে দেখে চাঁদের বুক আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু বেহুলা ডিঙা থেকেই শ্বশুরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—"এখনো মনসাকে পুজো না দিলে ধনজন সব কিছু নিয়ে আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে বাবা।"

তখন রোঙাই পণ্ডিতও চাঁদকে অনুনয় করতে লাগলেন। কিন্তু চাঁদ সদাগর ধনজনের মায়া করেন না—

"পদ্ম না পূজিব আমি পুষ্পদল দিয়া
ধনেজনে কার্য নাই, যাউক ফিরিয়া।"

এই কথা শুনে সনকা আর্তনাদ করে আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগলেন। চারিদিকে হাহাকার উঠল। কিন্তু তবু সদাগরের মন গলল না—

"যেই হস্তে পূজি মুই ত্রিশত দেবতা।
সেই হস্তে মুই কানীরে করিব পূজা?"

কিন্তু সতী সাধ্বী পুত্রবধূ বেহুলার শোকমলিন মুখের পানে তাকিয়ে চাঁদের প্রাণ যেন আর ধৈর্য মানছিল না—মৃত্যুঞ্জয়ী বেহুলাকে কেমন করে তিনি মিথ্যা বলে উপেক্ষা করবেন? তাকে ফিরিয়ে দেবেন কোন মুখে? অন্তর্দ্বন্দ্বে চাঁদের হৃদয় যেন দ্বিধা হয়ে যায়।

উমার মতো তপস্বিনী বেহুলাকে শিবভক্ত চাঁদ কেমন করে অস্বীকার করবেন আজ ?

তখন চাঁদের বিস্মিত চোখের সামনে আকাশে দেখা দিল এক অপরূপ দেবমূর্তি !

"এক রথে পদ্মাদুর্গা অন্তরীক্ষে স্থিতি।
দুইজনে দেখে চান্দ একই মূরতি॥"

বাঁ হাত বা ডান হাত যে হাতেই পূজো দিন না কেন, বেহুলার দিকে চেয়ে চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত মনসার পূজো দিলেন। চাঁদে পদ্মায় বাদ মিটল।

সতী বেহুলার প্রশংসায় দিকে দিকে ধন্য ধন্য রব উঠল।

*   *   *

আলালের ঘরের দুলাল

[বাংলা গদ্য সাহিত্য যখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের প্রভাবে আচ্ছন্ন সেই যুগে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩) নামে এক ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্ম নামে চলতি ভাষায় এবং নিজস্ব টেকনিকে এই বইটি রচনা করে সেই যুগে দারুণ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল সেদিন।

আলালের ঘরের দুলাল শুধু প্রথম বাংলা উপন্যাসই নয় সংস্কৃত বহুল কঠিন বাংলা ভাষার স্থলে সহজ সাবলীল বাংলা ভাষার সূচনাও বটে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই প্যারীচাঁদ স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'। 'আলালের ঘরের দুলাল' মুলত একটি কাল্পনিক কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত হলেও এর মধ্যে তখনকার সমাজের যে সব চিত্র পাওয়া যায় তার মূল্য বড় কম নয়। সেদিক থেকে বইটির আলাদা ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে।]

॥ এক ॥

বৈদ্যবাটির বাবুরামবাবু বিলক্ষণ ব্যক্তি। ফৌজদারী আদালতে কাজ করে ডান হাতে বাঁ হাতে টাকা কামিয়ে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। টাকা রোজগারের ব্যাপারে তাঁর ধর্মাধর্মের বালাই ছিল না।

এ দেশে ধন বা পদ বাড়লেই মান বাড়ে। সেজন্য বাবুরামবাবুর বৈঠকখানা সব সময়েই লোকে লোকারণ্য। ময়রার দোকানে যেমন দিন রাত মাছি ভন ভন করে বাবুরামবাবুর দরবারে তেমনি বহু চাটুকার সকল সময় গুঞ্জন করে তাঁর স্তব গায়।

বাবুরামবাবুর বড় ছেলে মতিলাল। মতিলাল বড় লোকের ছেলে—যেন আলালের ঘরের দুলাল। ছেলেবেলা থেকেই বাপ-মায়ের কাছে আস্‌করা পেয়ে বড্ড বাড় বেড়েছে। কথায় কথায় বায়না। কখনো বলে, বাবা, চাঁদ ধরব। কখনো বলে, বাবা তোপ খাব।

এ হেন মতিলালকে বাংলা শেখানোর ভার পড়ল বাড়ির সরকারের উপর।

প্রথম প্রথম মতিলাল কেঁদেকেটে গুরু মশাইকে আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে নাস্তানাবুদ করত।

বাবুরাম সরকারকে বলতেন, "ও তুমি কিছু মনে কোরো না। ওই আমার সবেধন নীলমনি, ভুলিয়ে ভালিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে শেখাও।"

কিন্তু শিখবে কে? তার নানা রকম উৎপাতে গুরুমশাইএর তো প্রাণ ছেড়ে যাবার যোগাড়।

ছেলে তো নয়—রত্ন। গুরুমশাই দেখলেন, ছেলেটি মা সরস্বতীকে একেবারে জলপান করে বসেছে। তিনি বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, "মতিলাল কলাপাত ও কাগজ লেখা, এমন কি জমিদারী হিসেব পত্র লেখাও শেষ করে ফেলেছে।"

শুনে বাবুরাম তো আহ্লাদে আটখানা।

চাটুকারের দল বলে উঠল, "হবে না! সিংহের সন্তান তো! সে কি আর শৃগাল হোতে পারে।"

বাবুরামবাবু এবারে পুত্ররত্নকে ব্যাকরণ শেখানোর জন্য বাড়ির পূজারী বামুনকে বললেন, "কেমন হে! তোমার ব্যাকরণ ট্যাকরণ পড়া আছে তো?"

পূজারী বামুন গণ্ডমূর্খ। কিন্তু চালাক লোক। ভাবল পূজোর চালকলায় তো আর আঁটে না। এবার বুঝি কপাল ফিরল। বললে, সে এক সময়ে এক মস্ত বেদান্তবাগীশের টোলে অধ্যয়ন করেছে।

কিন্তু কপাল মন্দ বলেই আজ আদাজল খেয়ে এই কাজে কর্তার বাড়ি পড়ে আছে।

বাবুরাম তাকেই মতিলালকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার ভার দিলেন।

মতিলাল এসে পূজারীকে ধমকে বলল, "ওরে ভিখিরী বামুন; তুই যদি আমায় হজবরল শেখাতে আসবি তো তোর চাল কলা পাবার উপায় শুদ্ধ বন্ধ করে দেব।"

বামুন দেখল, এখন ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি।

কয়েকদিন পরে বামুন কর্তাকে গিয়ে বললে, "কী মেধাবী ছেলে মতিলাল! সব শিখে শেষ করে ফেলেছ!"

কর্তা বললেন, "বল কি! এরই মধ্যে!"

বামুন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কী মাথা।"

এক মোসাহেব বলে উঠল, "এ ছেলে ক্ষণজন্মা। বেঁচে থাকলে দিকপাল হবে।"

বাংলা হল, ব্যাকরণ হল, এখন ফার্সি শেখা দরকার। মতিলালকে ফার্সি শিক্ষা দেবার জন্য বাবুরামবাবু এক মুনসিকে নিযুক্ত করলেন।

একদিন মতিলাল পিছন থেকে মুনসির লম্বা দাড়ির উপর একটা জ্বলন্ত টিকে ফেলে দিল।

মুনসি চীৎকার করতে করতে পালাল।

বাবুরামবাবু শুনে বললেন, "মতি তো আমার তেমন ছেলে নয়।"

॥ দুই ॥

বাবুরামবাবু এবারে ভাবলেন, ছেলেকে ইংরাজী পড়াবেন।

কিন্তু পড়াবে কে? আত্মীয়স্বজন সবাই তো তারই মত, আই গোজ, হি কম, ইসপীক নট, ইয়েস, নো, ভেরি গুড।

আত্মীয়দের মধ্যে বালীর বেণীবাবু যোগ্য ব্যক্তি।

চাকর ও পাইক-পেয়াদা নিয়ে বাবুরাম এলেন বৈদ্যবাটি থেকে বালী।

কিছুক্ষণ অন্যান্য আলোচনার পর আসল কথাটা পাড়লেন বাবুরাম, বললেন, "দেখো, মতিলালের বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় ভাল। দেখলে চোখ জুড়োয়। তাকে এবার একটু ইংরাজী পড়াতে চাই। অল্প সল্প মাইনেতে একজন মাষ্টার দাও!"

বেণীবাবু বললেন ; কুড়ি পঁচিশ টাকা মাসে দিলে মাঝারি গোছের মাষ্টার পাওয়া যায়। কিন্তু ছেলেকে মানুষ করতে গেলে ঘরে বাইরে তদারক চাই। বাপকে স্বচক্ষে সব দেখতে হয়। ছেলের সঙ্গে খাটতে হয়। অনেক কাজ বরাত দিয়ে চলে বটে, কিন্তু একাজে পরের মুখে ঝাল খেলে চলে না। কেবল সস্তা খুঁজলেও হয় না।"

বাবুরামবাবু বললেন, "আমার তো অনেক কাজের চাপ। তুমি ভাই ছেলেটির ভার নাও।"

অনেক বলা কওয়ার পর বেণীবাবু মতিলালের ইংরাজী শেখার ভার নিতে রাজী হলেন। বাবুরামবাবু হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

কয়েকদিন পরে একদিন সকাল বেলা একটি ছেলে গলায় মাদুলি, কানে মাকড়ী, হাতে বালা ও বাজু পরে বেণীবাবুর বাড়ীতে এসে উঠল।

এই ছেলেই হল মতিলাল।

কিন্তু ছেলে তো নয়—যেন পিলে। তার দৌরাত্ম্যে এক বেলাতেই বালীগ্রাম তছনছ হবার যোগাড়।

কখনো সে কারুর ঢেঁকিতে গিয়ে পা দেয়, কখনো কারুর ছাদে উঠে দুপদাপ করে। কখনো বা পথচারীদের গায়ে ইট পাটকেল ছুঁড়ে পিট্টান দেয়।

কারো বাগানের ফুল ছেঁড়ে, কারো গাছের ফল পাড়ে, কারো মটকার উপর উঠে লাফায়, কারো গায়ে থুতু দেয়, কারো জলের কলসী ভাঙে।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, "এই লংকাপোড়া হনুমান গ্রামটাকে ছারখার করবে নাকি ?"

বেণীবাবু দেখলেন, এমন ছেলেকে তিন দিন রাখলেই ভিটেয় নির্ঘাৎ ঘুঘু চরবে।

তিনি তখন বুদ্ধি করে পরদিন সকালেই মতিলালকে বৌবাজারে বেচারামবাবুর বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বেচারামবাবুর ছেলেপুলে নেই। দুটি ভাগ্নে আছে, হলধর ও গদাধর।

ঠিক হল, মতিলাল এখানে থেকে তাদের সঙ্গে লেখাপড়া করবে।

॥ তিন ॥

বৌবাজারে বাসা করে হিতে হল বিপরীত।

একে চায় আরে পায়।

হলধর গদাধর দেখল মতিলাল তাদেরই একজন। দু'একদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে মতিলালের গলায় গলায় ভাব হোয়ে গেল।

হলধর গদাধর ও মতিলাল গোকুলের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়ায়। যা ইচ্ছা তাই করে।

পাড়ার যতসব লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া এসে জুটল। দিনরাত হট্টগোল। কেবল হাসির গররা এবং তামাক গাঁজার ছররা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার।

সংগদোষে সব গোল্লায় যায়।

মতিলাল দু' একদিন স্কুলে যায় তো সাক্ষীগোপালের মত বসে থাকে। নয়তো ছেলেদের সঙ্গে ফস্‌টি নস্‌টি করে।

তখন ইংরেজ আমল সবে শুরু হয়েছে।

স্কুলের শিক্ষা তো ভড়ুঙে শিক্ষা। শুধু মোটা মোটা বই পড়ানোর বার-চটক। উপরে চাকণ চিকণ ভিতরে খ্যাড়া। বাইরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কেত্তন।

ছেলেরা বুঝুক বা না বুঝুক, মুখস্ত বলে গেলেই হল!

বটতলার বক্রেশ্বরবাবু কলুস সাহেবের স্কুলে মাষ্টারি করতেন। উঁচু ক্লাসে যা পড়াতেন তার মানে তিনি নিজেই জানতেন না। মানে জিজ্ঞেস করলে বলতেন। "ডিক্সিনারি ছাখ্।"

বড় লোকের ছেলেদের তিনি বড় আদর করতেন। মতিলাল দু'একদিনের মধ্যেই বক্রেশ্বরবাবুর প্রিয়পাত্র হোয়ে উঠল।

বক্রেশ্বরবাবু বুঝলেন, "এমন ছেলে বড় হয়ে উঠলে আমার বেগুন ক্ষেত হবে। শিক্ষা নিয়ে খুঁটিনাটি করলে কি চলে? তা কি আমার পরকালে সাক্ষী দেবে।"

অতএব মতিলালের বেপরোয়া কীর্তিকলাপ বাড়তেই লাগল।

একদিন হাফ স্কুল করে বাড়ি ফেরার পথে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে রাখল।

খবর শুনে বাবুরামবাবুর বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল।

বক্রেশ্বর বললেন, "মতি তো তেমন ছেলে নয়। ছেলে তো নয় যেন পরেশ পাথর।"

ইতিমধ্যে বাবুরামবাবুর আর এক সাকরেদ জুটেছে। তার নাম ঠকচাচা। বজ্জাতের হাড়।

ঠকচাচা, বক্রেশ্বর, বাঞ্ছারাম আর উকিল বটলর সাহেব এই ক' জনে মিলে হয়েছে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করে তারা সবাই গিয়ে আদালতে হাজির হল—মতিলালকে খালাস করে আনতে।

ঠকচাচা প্রথমে সাক্ষী দিল। জেরার মুখে অম্লান বদনে বললে, অমুক দিন অমুক সময়ে সে মতিলালকে অমুক বাড়িতে বসে ফার্সি বই-এর অমুক জায়গা পড়াচ্ছিল।

উকিল বটলর সাহেবও ওস্তাদ জুড়িদার। সেও জোর বক্তৃতা করতে লাগল।

বিচারে মতিলাল খালাস পেল।

অমনি হরিবোল শব্দ হল। বাবুরামবাবু উচ্চকণ্ঠে ম্যাজিসট্রেট সাহেবকে বললেন, "ধর্মাবতার! ধন্য আপনার বিচার! আপনি শীঘ্রই গবর্ণর হবেন।"

অনেকেই ভেবেছিল, এবার বুঝি মতিলাল সুযুত হয়ে আসবে।

কিন্তু বাড়ি এসে সেদিন সারাটা রাত শেয়াল-কুকুরের ডাক ডেকে সে সারা পাড়া জ্বালিয়ে তুলল।

এই যে ভয় নেই, ডর নেই, লজ্জা নেই, অপমান নেই, এটা কম রোগ নয়। এ মনের রোগ। ঠিক ওষুধ পড়লে তবে সারে।

শিশুশিক্ষা ছেলেখেলা নয়। ছোট কাঁচা বয়সের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া একটা মস্ত দায়িত্বের কাজ। এ কাজে ভাল শিক্ষক চাই, ভাল বই চাই, শেখাবার কায়দা চাই, আর চাই ভাল পরিবেশ, ভাল সংসর্গ। এর যে-কোন একটার অভাব থেকেই ঘরে আগুন লাগতে পারে।

কিন্তু বাবুরামবাবুর ধারণা, মতিলাল বড় ভাল ছেলে। সম্প্রতি তাঁর ধারণা কিছু বদলালেও লোকের কাছে মাথা হেঁট করার ভয়ে ছেলের হয়ে হিতৈষীদের সঙ্গে লড়তেও তিনি পিছপাও হন না।

ফলে মতিলালের হল পোয়া বারো। সে বাপের চোখে ধুলো দিয়ে দলবল নিয়ে নানা অসভ্য ও অসৎ কাজ করতে লাগল। বলতে লাগল, "বুড়ো একবার চোখ বুজলেই মনের সাধে বাবুয়ানা করব।"

॥ চার ॥

মতিলালের ছোট ভাই রামলাল। সে যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। যেমন বিদ্যা, তেমনি সৎবুদ্ধি। যেমন দেহের গড়ন, তেমনি মনের গড়ন।

এ সবই বরদা বিশ্বাস নামে পূর্ববঙ্গবাসী এক সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষার ফল।

বাড়ির সংসর্গ রামলালের ভাল লাগে না। সেজন্য সে অনেক সময়ই বরদাবাবুর কাছে কাছে থাকে।

বরদাবাবু জানেন, কী করে ছেলেকে শিক্ষাগুণে সত্যিকার মানুষ করে তুলতে হয়। তাড়াহুড়ো করে শিক্ষা দিলে কেবল পাথরে কোপ মারা হয়। একশোবার কোদাল মারলেও এক মুঠী মাটি কাটা হয় না।

রামলালকে তিনি সেইভাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাই বরদাবাবুকে লোকে যেমন শ্রদ্ধা করে, রামলালকেও তেমনি ভালবাসে।

কিন্তু বাবুরামবাবু বিষয়ী লোক। তাঁর কাছে রামলালের এই সব ব্যবহার ভাল ঠেকল না। তিনি ভাবলেন, ছোট ছেলেটি কেমন যেন আলগা রকম।

আর মতিলালের সাঙ্গপাঙ্গরা স্পষ্টই বলতে লাগল, রামলালকে এবার পাগলা গারদে পাঠাতে হবে।

এদিকে ঠকচাচা বড় ভাবনায় পড়েছে।

রামলাল সব বিষয়ে যে রকম চোখোস হয়ে উঠছে তাতে বাবু-রামের বিষয়ের উপর ছোবল মারা আর অত সহজ কাজ হবে না। সে বুঝল, রামলালকে সরাতে হলে, গোড়া শুদ্ধ ওপড়াতে হবে, অর্থাৎ বরদাবাবুকে আগে ফাঁদে ফেলতে হবে।

ঠকচাচা বাবুরামবাবুকে বোঝালো, বরদাবাবুই যত নষ্টের গোড়া।

বরদাবাবুকে তাই মিথ্যা খুনের মামলায় জড়ানো হল। কিন্তু তিনি বিচারে খালাস পেলেন। তিনি বুঝলেন, বাবুরামের পিছনে যে শনি লেগেছে তাতে ঝাড়ে বংশে ঘাড় মটকে তবে ছাড়বে।

॥ পাঁচ ॥

হঠাৎ মারা গেলেন বাবুরামবাবু।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করে ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বর সবাই নিজেদের পকেট ভারী করবার তালে ফিরতে লাগল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর গদি পেল মতিলাল।

বাঞ্ছারাম আর ঠকচাচা মিষ্টি কথায় মতিলালকে সদা সর্বদা ভিজিয়ে রাখে।

মতিলাল বিলাসের স্রোতে টলমল করে দুলতে লাগল। ছোট ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। মা'র উপর অত্যাচার শুরু করল। মা দুঃখে ও লজ্জায় মেয়েদের নিয়ে কাশীবাসী হলেন। রামলাল দেশান্তরে চলে গেল।

বাঞ্ছারামের পরামর্শে মতিলাল সব তালুক বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে গেল ইয়ার দলের সঙ্গে।

দিনরাত চলল নাচগান ভাঁড়ামো নেশা চড়ুই-ভাতি।

জান-সাহেবের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসা।

কিন্তু ঠকচাচা আর বাঞ্ছারামের চুরী জুয়াচুরীতে ব্যবসার মূলধন গেল কমে। দু'এক বছরের মধ্যেই জান কোম্পানী লালবাতি জ্বাললো। লোকসান প্রায় লাখ টাকা।

সব লবেজান দেখে জান সাহেব চন্দননগরে গা ঢাকা দিল।

পাওনাদাররা এসে মতিলালকে ছেঁকে ধরল। মতিলালের পকেটও তখন গড়ের মাঠ।

ঠকচাচা এবার কাজ গুছিয়ে দে চম্পট। মতিলালও এক রাত্রে পালিয়ে এল বৈদ্যবাটিতে।

মতিলাল আর সে মতিলাল নেই। তার টাকা সব গেছে। অতএব বন্ধুদের টিকিও এখন আর দেখা যায় না।

পাওনাদাররা বৈদ্যবাটির বাড়ি নিলাম করে নিলে। মতিলালের মা-বোন আশ্রয় নিলে বরদাবাবুর বাড়ি।

এদিকে জালজুয়াচুরীর দায়ে ধরা পরে ঠকচাচার হল দ্বীপান্তর।

মতিলাল বহু ঘোড়াঘুরি করেও টাকার যোগাড় করতে না পেরে কাশীর দিকে রওনা হল। সেদিন আর কোন বন্ধু তার সঙ্গী হল না।

এতদিনে মতিলাল ঠেকে শিখল। কাশীতে এক সাধু পুরুষের সংসর্গে এসে তার সুবুদ্ধির উদয় হল। সে বুঝল, তার কতখানি অধঃপতন হয়েছে।

এক সাধুর সঙ্গে ঘুবতে ঘুরতে মতিলাল এক মথুরায়। সেখানে একে একে বরদাবাবু, রামলাল ও মা-বোনদের সঙ্গে তার দেখা হল। মতিলালের মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে দেখে সবাই খুশী হল।

বরদাবাবু সবাইকে নিয়ে বৈদ্যবাটি ফিরে এলেন। পাওনাদারদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে রামলাল বাপের ভিটে ফিরে পেল।

তারপর দু'ভাই মিলে-মিশে বৈদ্যবাটির ভাঙা সংসার জোড়া দিয়ে সুখ আর শান্তিতে দিন কাটালো।

স্বর্ণলতা

[তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বঙ্কিমের সর্বজনচিত্তজয়ী প্রভাবের মধ্যেও নিজস্ব লিখনশৈলী ও চিন্তাধারার বৈশিষ্টে শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদের অন্যতম রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তাঁর 'স্বর্ণলতা' বইটিকে বলা হয় বাংলার প্রথম বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস। এই কাহিনীতে গ্রাম-বাংলার গার্হস্থ্যজীবনের যে চিত্র বিধৃত তা যেমন নিখুঁত তেমনি হৃদয়গ্রাহী, লিখনভঙ্গীর কারুকৃতিতে প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত। 'স্বর্ণলতা' বাংলা কথাসাহিত্যের একটি কালজয়ী সৃষ্টি। তিনি আরও কয়েকটি বই লেখেন, যথা, 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট' এবং 'তিনটি গল্প'। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে স্বর্ণলতা-ই নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ।]

॥ এক ॥

কৃষ্ণনগরের কাছে এক গ্রামে দুই ভাই থাকতেন। অল্প বয়সেই তাঁদের পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়েছিল। বড় শশিভূষণ তরুণ বয়সেই গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায় কাজে ঢুকে কিছু দিনের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। মাহিনা অল্প হলে কি হয়, টাকা রোজগার করবার ফন্দী ফিকির জানতেন তিনি। ছোট ভাই বিধুভূষণ লেখাপড়া শিখলেন না। সংসারে তেমন আসক্তি নেই। গানবাজনা, আমোদ-আহ্লাদ করেই দিন কাটান। কোন আয় তাঁর নেই। ভাইয়ের পোষ্য হয়ে আছেন বললেই হয়।

পয়সাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী বলে প্রমদার খুব অহঙ্কার। এই নিয়ে ছোট জা সরলাকে সে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। সরলা যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ। মুখ বুজে বড় জায়ের যখন তখন মুখ নাড়া সহ্য করে, অহোরাত্র সংসারের যাবতীয় কাজে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, কিন্তু বড় জায়ের মন কিছুতেই পায় না।

প্রমদা মাঝে মাঝেই স্বামীকে বলে, এমন করে খরচ করে আর কতকাল চলবে, তাদের ছেলেমেয়ে আছে, তাদের মুখ চাইতে হবে তো। অতএব এখন পৃথক হওয়াই ভাল।

শশিভূষণ সেকথায় কান দেন না। বিধুভূষণকে তিনি ভালবাসেন। সরলার প্রতিও তাঁর মমতার অন্ত নেই।

কিন্তু একদিনের একটা ব্যাপারে শশিভূষণ আত্মবিস্মৃত হলেন এবং ভাইকে পৃথক করে দিলেন। সেদিন এক ফেরিওয়ালা এসেছিল পাড়ায়। প্রমদা তার কাছ থেকে নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে একটি করে বাঁশি কিনে দিল। সরলার ছেলে গোপাল অদূরে দাঁড়িয়েছিল। সে মায়ের কাছে গিয়ে বায়না ধরল তারও একটি বাঁশি চাই।

সরলার কাছে একটিও পয়সা ছিল না। সে প্রমদার কাছে গিয়ে বললে, দিদি, একটা পয়সা ধার দেবে? উনি এলেই তোমায় দিয়ে দেব।

প্রমদা মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, দিদি তো মহাজন নয় যে ধার দেবে!

সরলা বললে, যদি ধার না দাও তো গোপালকেও একটা বাঁশি কিনে দাও।

প্রমদা অম্লান বদনে বললে, আমি তো আর কল্পতরু হয়ে বসিনি যে, যে যা চাইবে তাই দেব। আমার কি আর সে কপাল! ওঁর যদি বুদ্ধি থাকতো, এতদিন টাকার বস্তার ওপর বসে থাকতেন।

এই বলে প্রমদা যেন কান্না রোধ করতেই চোখে আঁচল চাপা দিল। সরলা তো অবাক।

এদিকে ফেরিওয়ালা ব্যাপার বুঝে এবং গোপালের ম্লান মুখ দেখে তার হাতে একটা বাঁশি দিয়ে পয়সা না নিয়েই চলে গেল। তাই দেখে প্রমদা মনে মনে জ্বলতে লাগল।

স্বামী বাড়ী আসতেই সাতখানা করে লাগালো প্রমদা। সরলা

অত্যন্ত ঝগড়াটে, অত্যন্ত ছোট তার মন। শুধু তাই নয় সে আজ তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করেছে!

শশিভূষণ আশ্চর্য হলেন, বিরক্তিও বোধ করলেন, বললেন, কি বলেছে সে?

প্রমদা তখন বেশ ফলাও করে বলতে লাগল, তুমি শুনলে প্রত্যয় করবে না। আজ একজন মনিহারি দোকান নিয়ে এসেছিল। বিপিন কামিনী ছাড়ে না, তাই তাদের দুটি পয়সা দিয়ে দুটো বাঁশি কিনে দিলাম। ছোট গিন্নি অমনি গোপালকেও একটা বাঁশি দিলে। দাম দেবার সময় বললে, 'দিদি আমায় একটা পয়সা ধার দাও, আমি সুদ দেব। আমি বললাম, 'এক পয়সার আবার সুদ কি ভাই, তা তো আমি জানি না।' ছোট বউ বললে, 'চিরকাল মহাজনী করছ, জান না কেন?' আমি শুনে অবাক। তারপর ছোট বউ যা মুখে এলো তাই বললে।

শশিভূষণ স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করলেন।

॥ দুই ॥

গানের আসরে বসে বাহবা দিয়ে, যাত্রার দলে বাজনা বাজিয়ে আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন বিধুভূষণ, হঠাৎ পৃথক হয়ে যেন দিশেহারা হলেন। প্রথম প্রথম দোকানে ধার পাওয়া যাচ্ছিল, বন্ধুদের কাছেও ধার করছিলেন, কিন্তু সেভাবে আর কতদিন চলে? তারপর ঘটিবাটি গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে কিছুদিন চালালেন। ক্রমে প্রত্যহ দু'সন্ধ্যা আহার বন্ধ হল। পরিবারে চারজন লোক। নিজে, সরলা, গোপাল আর দাসী শ্যামা। শ্যামা আগে দু'ভাইয়ের সংসারে ছিল। পৃথক হবার সময় বিধুভূষণের দিকে এসেছে। এক বেলা খেয়েও

সে সরলাকে ছেড়ে যেতে পারেনি! বলত, গোপালের মত তার একটি ছেলে ছিল। আদর করে সে তারও নাম রেখেছিল গোপাল। তাই গোপালকে ছেড়ে সে আর কোথাও যাবে না।

একদিন বিধুভূষণ সজল চোখে স্ত্রীর কাছে বললেন, আর তো কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না, সরলা। কী হবে?

শ্যামা কাছেই ছিল, এগিয়ে এসে বললে, তুমি অত ভাবছ কেন, ঠাকুর। আমার কিছু টাকা আছে। সে টাকা তো গোপালকেই দেব ঠিক করে রেখেছি। আমার একটা পরামর্শ শোন। তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ নাও। কাজ তুমি পাবেই। যতদিন না পাও আমি যেমন করে পারি, পরের বাড়ি খেটেও চালাবো। এর পর যখন সচ্ছল হবে, তখন আমায় দিও। দিলে গোপালেরই থাকবে।

শ্যামার কথা শুনে বিধুভূষণ অবাক হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে শ্যামার কাছ থেকে কয়েকটি টাকা নিয়ে বিধুভূষণ ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্যস্থল কলকাতা।

॥ তিন ॥

সরলাকে পৃথক করে দিয়ে প্রমদা তিন চার দিন মহা আনন্দে রইল। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঝগড়াঝাঁটি করা যার স্বভাব তার অত নির্বিবাদে থাকা সইবে কেন? প্রমদার সংসারে রান্না করত ঠাকরুণ দিদি। আর কাউকে না পেয়ে প্রমদা তাকে নিয়ে পড়ল। সকাল বিকেল তার কাজের খুঁত ধরতে লাগল, বকাবকি সুরু করল। ঠাকরুণ দিদি তো আর সরলা নয়। দু'দিন সহ্য করে তিন দিনের দিন, এই রইল তোমার কাজ, বলে চলে গেল।

কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে না পেরে প্রমদা কাঁদতে শুরু করল।

এখন সংসারের কাজগুলো করে কে? কাজের নামে যে প্রমদার গায়ে জ্বর আসে! ফলে, সময় মত আহার পাওয়া শশিভূষণের পক্ষে দুরূহ হল! স্ত্রীর উগ্রচণ্ডা মেজাজের পরিচয় তাঁর অজানা ছিল না, তিনি নীরবে কোন মতে কোনদিন নিজে রেঁধে খেয়ে কোনদিন ফলার খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর একদিন কাছারি থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন বাড়িতে যেন মোচ্ছব লেগেছে। ছেলেমেয়ে দু'জন কলরব করছে! অন্য মানুষদেরও গলা পাওয়া যাচ্ছে।

কী ব্যাপার! শুনলেন, প্রমদা তার মাকে আনিয়েছে। মা না হলে সংসার চালাবে কে? শুধু মা নয়, সঙ্গে এসেছে প্রমদার ভাই। তার নাম গদাধরচন্দ্র! গদাধরচন্দ্র ঈশ্বরের এক বিচিত্র সৃষ্টি। যেমন তার আকৃতি, তেমনি প্রকৃতি। তার ওপর তার আবার জিভের আড় ভাঙেনি। সে 'ত' উচ্চারণ করতে পারে না বলে 'ট', নিজের নাম বলে, গডাঢর চণ্ড্র।

আকাট মূর্খ হলে কি হয়, গদাধরচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! দিদির কাছে সরলাদের কথা জেনে নিয়ে সে যখন তখন তাদের ঘরের সামনে গিয়ে আস্ফালন করতে লাগল। একদিন বিনা কারণে শ্যামার সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। শ্যামাও কম যায় না। বাড়ির ভিতর থেকে একটা আঁশ বটি নিয়ে বেরিয়ে এসে সে গদাধরকে তাড়া করল। তখন গদাধর বীরবিক্রমে পশ্চাদাপসরণ করে সোজা গিয়ে থানায় হাজির হোয়ে শ্যামার নামে নালিশ করল। থানার দারোগা বাবু দু'চার কথাতেই গদাধরকে বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি তাকে দিলেন প্রচণ্ড এক ধমক। ধমক খেয়ে গদাধর পালাতে পথ পেল না।

এদিকে শশিভূষণ নিজ বাসভূমে পরবাসী হোয়ে দিন যাপন করতে লাগলেন। গদাধরের হাকডাঁক, শাশুড়ীর গৃহিনীপনা, মা আর

ভাইকে নিয়ে প্রমদার আদিখ্যেতা—দেখে শুনে শশিভূষণ মনে মনে শুধু বললেন, হায় ভগবান!

শেষ পর্যন্ত এমন হল যে তাঁর থাকবার ঘরখানিও বেদখল হবার জোগাড়। গদাধরের শোবার ঘর চাই, বৈঠকখানা চাই, শাশুড়ীর শোবার ঘর চাই, পূজোর ঘর চাই।

উপায়ান্তর না দেখে শশিভূষণ নিজেদের ভদ্রাসনের কাছে জমি কিনে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরী করালেন। এবং সপরিবারে নতুন বাড়িতে চলে গেলেন। সরলা, গোপাল আর শ্যামা পুরনো বাড়িতে রইল।

॥ চার ॥

কলকাতায় যাবার পথে বিধুভূষণের একটি সঙ্গী জুটলো। তার নাম নীলকমল। পাগল পাগল চেহারা। খালি পা, ছেঁড়া জামা-কাপড়, কাঁধে একটা বেহালা। নীলকমল জানালো, তার মতো বেহালা বাজাতে সাতখানা গাঁয়ে একজনও নেই এবং সে কলকাতায় চলেছে কোন যাত্রার দলে বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করবে বলে। বিধুভূষণকে সে তার বেহালা আর গান শুনিয়ে দিলে। ভাঙা বেহালায় কর্কশ আওয়াজ তুলে বেসুরে ভাঙা গলায় সে গান ধরল:

পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে পদ্মবনে আমি যাব
আনিয়ে সে নীলপদ্ম চরণ-পদ্মে দিব।

তার গান আর বেহালা শুনে হাসি সংবরণ করা বিধুভূষণের পক্ষে কঠিন হল, কোন রকমে হাসি চেপে বললেন, চমৎকার। কলকাতায় গেলে যে-কোন যাত্রার দল তোমায় লুফে নেবে। চল,

আমার সঙ্গে। প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে মাকালী দর্শন করা তারপর কোন পাণ্ডার বাসায় উঠে যাত্রার দলের খোঁজ করা যাবে।

কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে কালীঘাটে গিয়ে একদল পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে তাঁরা এমন নাস্তানাবুদ হলেন যা বলবার নয়। পাণ্ডাদের টানাহেঁচড়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নীলকমল তাদের হাত ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল। অনেক চেষ্টা করেও বিধুভূষণ তাকে খুঁজে পেলেন না!

শেষ পর্যন্ত একটি সজ্জন পাণ্ডা পেয়ে বিধুভূষণ তার বাসায় গিয়ে উঠলেন এবং পাণ্ডাটির কাছ থেকেই এক পাঁচালী দলের সন্ধান পেলেন। তারা নাকি একজন বাজনদারের খোঁজ করছে।

বিধুভূষণ পাঁচালীর অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন। বিধুভূষণের কথাবার্তা আর বাজনা শুনে অধিকারী যেন হাতে স্বর্গের চাঁদ পেল। সঙ্গে সঙ্গে বিধুভূষণ কাজ পেলেন। আর তিনি সেই দলে যোগ দেবার পর থেকেই দলের অদৃষ্টও যেন ফিরে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই সেই দলের নাম ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশ থেকে বায়না আসতে লাগল। বিধুভূষণের আয়ও দিন দিন বৃদ্ধি পেল।

কিছু টাকা হাতে পাবা মাত্রই বিধুভূষণ সরলাকে রেজেষ্টারি করে একটি চিঠি এবং সেই সঙ্গে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

বিধুভূষণের ভাগ্য বুঝি ফিরল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, বেশ কিছু অর্থের সঞ্চয় না করে তিনি দেশে ফিরবেন না। কিন্তু সেখানকার খরচপত্র চলা চাই তো? তাই তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে লাগলেন। বাড়ি থেকে তাঁর চিঠির কোন জবাব পেতেন না বটে, কিন্তু গোপালের স্বাক্ষরিত রসিদ দেখে মনে করতেন, টাকা ঠিকই সরলার হাতে পড়ছে, গোপাল ছেলেমানুষ, ভাল করে লিখতে শেখে নি বলে তাঁকে পত্র লেখে না।

কিন্তু সেই সব টাকা সরলা পায় নি।

বিধুভূষণের প্রথম চিঠিটা গদাধরচন্দ্রের হাতে গিয়ে পড়ে। গদাধর চিঠি খুলে তার মধ্যে নোট দেখে প্রমদাকে গিয়ে জানায়। প্রমদা তাকে রসিদ সই করে চিঠি রাখবার পরমার্শ দেয়।

এই ভাবে প্রথম চিঠির পর দ্বিতীয় চিঠি, তারপর সমস্ত চিঠি আর টাকা গদাধর আত্মসাৎ করতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

মাস গেল। বছর গেল। দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। সরলা বিধুভূষণের কাছ থেকে কোন পত্র পেল না। ভাবনায় তার শরীর জীর্ণ হোয়ে পড়ল। ক্রমে কঠিন রোগে আক্রান্ত হল সে।

এতদিন পর্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল তাইতে কোন রকমে চলছিল। ক্রমে সে বলও ফুরিয়ে এলো। সরলা আরও ভেঙ্গে পড়ল। রোজ বিকেলে তার জ্বর হয়। বুকের মধ্যে যেন খাঁ খাঁ করে। সরলা আজকাল আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারে না।

শ্যামা সকালে উঠে সরলার সেবা শুশ্রূষা করে পাড়ায় বেরোয়। কোন বাড়ীর কাজকর্ম করে দিয়ে নিজের খাবার জন্যে যা পায় তাই এনে গোপালকে আর সরলাকে খাওয়ায়। তারপর নিজে আর এক বাড়ী গিয়ে তাদের কাজ করে দিয়ে খেয়ে আসে।

এমনি করে আরও এক বছর কাটলো।

এলো এক ভাদ্র সন্ধ্যা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। পথঘাট জনশূন্য। সেই বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় বিধুভূষণ দেশে ফিরে নিজের বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু বাড়ী এত নিস্তব্ধ কেন ? ছেলে-মেয়েদের কথা তো শোনা যাচ্ছে না ! বিধুভূষণ আতংকিত হলেন। গোপাল, শ্যামা, সরলার নাম ধরে ডাকলেন।

কে ? কে ? বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে এলো শ্যামা।

বিধুভূষণকে দেখে অবাক হয়ে বললে, ঠাকুর, সত্যিই কি তুমি ফিরে এলে এত দিনে !

বিধুভূষণ বললেন, কেন, আমি তো তোমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে আজ আমি দেশে এসে পৌঁছবো।

শ্যামা বিস্মিত হোয়ে বললে, তোমার চিঠি ! এত দিনের মধ্যে একখানা চিঠিও তোমার পাইনি।

শুনে হতবাক হলেন বিধুভূষণ। এ কী বলছে শ্যামা !

শ্যামা বললে, চিঠির কথা থাক। ভিতরে এসো !

ভিতরে ঢুকে সরলাকে দেখে কেঁদে ফেললেন বিধুভূষণ ! এ কী অবস্থা হয়েছে সরলার ! সোনার প্রতিমা যে কালী হয়ে গেছে ! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, সরলা, তোমায় যে এভাবে দেখবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

কোন মতে বিছানা থেকে উঠে স্বামীকে প্রণাম করে মৃদু করুণ হেসে সরলা বললে, তুমি এসেছো, এবার আমি ভাল হোয়ে উঠবো।

পরদিন সত্যিই সরলাকে অনেক ভাল দেখালো। সে চলে ফিরে ঘরের কাজকর্ম করল কিছুক্ষণ ! বিধুভূষণের পাশে বসে স্বামীর কাছে কলকাতার অনেক গল্প শুনল। তারপর বললে, এবার আমি শুয়ে পড়ি। বড় ঘুম পাচ্ছে।

সরলা সেই যে শুল আর উঠল না। শেষ রাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে চিরদুঃখিনী সরলা শেষ সময়ে পরম সুখে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ছয় ॥

সরলার মৃত্যুর পর একদিন শ্যামার সঙ্গে সাংসারিক কথা আলোচনা করতে করতে বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, শ্যামা, তোমরা আমার একখানাও চিঠি পাওনি ?

শ্যামা উত্তর দিল, একখানাও পাই নি।

বিধুভূষণ বললেন, তাহলে রেজেষ্টারি চিঠিতে গোপালের নাম সই দিত কে ?

শ্যামা বললে, গোপালের নামে কোন রেজেষ্টারি চিঠি আসেনি, সে সইও দেয়নি। মাঝে মাঝে গদাধর রেজেষ্টারি চিঠি পেতো, সে রসিদ-টসিদ দিত। বলত, তার মামা নাকি তাকে টাকা পাঠায়।

শ্যামার কথা শুনে বিধুভূষণ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, শ্যামা, টের পেয়েছি। সব চিঠি আর টাকা ওই গদা-ই নিয়েছে। আমি চললাম থানায়।

থানার দারোগা বিধুভূষণের নালিশ শুনে তখনি তদন্ত করলে। ডাকহরকরাকে ডেকে পাঠিয়ে তার মুখে গোপালের চেহারার যা বর্ণনা শুনলেন, তাতে তিনি এবং বিধুভূষণ দুজনেই বুঝলেন, চেহারার সঙ্গে গদাধরের হুবহু মিল।

দারোগা শশিভূষণের বাড়ী তল্লাসী করবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাপার জানতে পেয়ে শশিভূষণ গদাধরকে মেয়ে সাজিয়ে অন্যত্র পাঠাবার চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। গদাধর ধরা পড়ল। এবং বিচারে সেসনজজ তাকে চোদ্দো বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

গদাধরের শাস্তি হল বটে কিন্তু তাতে বিধুভূষণ মনে শান্তি পেলেন না। তাঁর আর এ বাড়ীতে থাকবার ইচ্ছা রইল না। নানা প্রকার

চিন্তা করে তিনি শ্যামা আর গোপালকে নিয়ে আবার কলকাতায় গেলেন এবং গোপালকে আর শ্যামাকে একটি বাড়ীতে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। সেই বাড়ীতে শ্যামা রাঁধুনির কাজ করে। গোপাল ডাক স্কুলে ভর্তি হোয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। বিধুভূষণ তখন এক ডেপুটি কলেকটারের সঙ্গে ঢাকায় চলে গেলেন।

ডেপুটি কলেকটারটির গানবাজনার খুব শখ। তিনি বিধুভূষণের গান বাজনা শুনে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং ঢাকায় গিয়ে তাঁকে একটি মুহুরির কাজ দিলেন। কাজ সামান্যই। কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় মনিবকে নিয়ে সংগীত চর্চ্চা করেই তাঁর সময় কাটতে লাগল।

ঢাকায় গিয়ে পরম সুখে রইলেন বিধুভূষণ। নিজের খরচপত্র সামান্যই। যে টাকা উদ্বৃত্ত হ'ত তা গোপালকে পাঠিয়ে দিতেন।

॥ সাত ॥

চাকা ঘুরলো। একদিকে বিধুভূষণ এতদিন পরে সুখ শান্তির সন্ধান পেলেন আর অন্যদিকে শশিভূষণের জীবনে দারুণ অশান্তি আর বিপদ ঘনিয়ে উঠল।

কোন খবর পেয়েই হোক বা নিজের থেকেই হোক, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শশিভূষণের কর্ম্মস্থলে এসে তাঁর কাছে জমিদারির কাজকর্মের হিসাব চাইলেন।

শশিভূষণের মাথায় যেন বাজ পড়ল! হিসাব কেমন করে দেবেন? অনেক টাকার গরমিল যে! একমাত্র উপায় আছে। যদি তাঁর চারজন সহকর্মী তাঁকে সাহায্য করে তাহলে রাতারাতি খাতাপত্র পাল্‌টে ফেলা যায়! তিনি কাতর ভাবে তাদের সাহায্য

প্রার্থনা করলেন। তারা প্রথমে রাজী হল না। অবশেষে বললে, শশিভূষণ যদি এখনি তাদের চার হাজার টাকা দেন তো তারা আজ রাত্রের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলবে।

শশিভূষণ রাজী হোয়ে টাকা আনতে বাড়ী গেলেন। চার হাজারের অনেক বেশী টাকাই আছে প্রমদার কাছে। সে নিশ্চয়ই স্বামীর এই বিপদে টাকা বার করে দিতে দ্বিধা করবে না।

কিন্তু স্ত্রীর কাছে টাকা পেলেন না শশিভূষণ। সব শুনে প্রমদা বললে, টাকা দিলেও তুমি রক্ষা পাবে না। আর টাকা গেলে আমাদের কি হবে ?

শশিভূষণ স্ত্রীকে অনেক বোঝালেন, অনেক অনুনয় বিনয় করলেন, এমন কি তার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু প্রমদা যেমন শক্ত কাঠ হয়ে বসেছিল তেমনি রইল, টাকা বার করল না।

তখন শশিভূষণ পাগলের মতো বলতে লাগলেন, প্রমদা, এতদিনে তোর সব সৎপরামর্শের অর্থ বুঝতে পারলাম। তুই আমায় বোকা বলতিস। আমি যথার্থই বোকা। তা নইলে তোর মতো পাপীয়সীর কথায় আমার প্রাণের ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব কেন। আমার ঘরের লক্ষ্মী সরলাকেই বা মেরে ফেলবো কেন ? এ সবই আমার কর্মফল ! শেষ পর্যন্ত তুই আমাকেও মারলি।

এই বলে শশিভূষণ উন্মাদের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাঁর সব অপরাধ স্বীকার করলেন।

হাকিম তাঁর স্বীকারোক্তি লিখে নিলেন এবং টাকা আদায়ের জন্যে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আটক করবার আদেশ জারী করলেন।

। আট ।

বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী বর্ধমানের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি। তাঁর একটি ছেলে, নাম হেমচন্দ্র, একটি মেয়ে, নাম স্বর্ণলতা। হেমচন্দ্র কলকাতার বাসায় থেকে পড়াশুনা করে। স্বর্ণলতা তার দাদার কাছে লিখতে পড়তে শিখেছে। ভাই বোনে খুব ভাব। বিপ্রদাস বিপত্নীক।

কলকাতায় হেমচন্দ্র যে বাসায় থাকতো, তার সামনেই গোপালের বাসা। হেম প্রায় প্রত্যহই গোপাল স্কুল যাবার সময় তাকে দেখতে পেতো এবং গোপালের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করত। ক্রমে গোপালের সঙ্গে তার আলাপ হল এবং শীঘ্রই সে আলাপ গভীর স্নেহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল।

গোপালের সব কথা শুনল হেমচন্দ্র। শুনে তার মন মমতায় ভরে উঠল। সে তখন গোপালের কাছে প্রস্তাব করল, গোপাল আর শ্যামা তার বাসায় এসে থাকুক, অনেক ঘর দুয়ার আছে, কোন অসুবিধা হবে না। হেমচন্দ্র আরও বললে যে সে গোপালকে নিজের ছোট ভাই-এর মতো মনে করে।

গোপাল শ্যামার সঙ্গে পরামর্শ করল।

হেমচন্দ্র প্রতিদিন তাদের চলে আসবার জন্যে বলতে লাগল। গোপাল সে অনুরোধ এড়াতে পারলো না। দু'জনের সম্পর্ক আরও সোহার্দ্যপূর্ণ হল।

পূজোর সময় হেম গোপালকে দেশের বাড়িতে নিয়ে গেল। স্বর্ণলতার সঙ্গে গোপালের পরিচয় হল। কিশোরী স্বর্ণলতা গোপালকে দেখে তার দুঃখের কথা জেনে তার প্রতি গভীর মমতা বোধ করল. সর্বক্ষণ সে গোপালের সঙ্গে গল্প করে কাটাতে লাগল, দাদাকে ছেড়ে সে গোপালের কাছে প্রত্যহ বই নিয়ে বসে পড়তে লাগল।

বিপ্রদাসবাবুর স্ত্রী অনেকদিন আগেই গত হয়েছিলেন। তিনি উইল করে সমস্ত সম্পত্তি ছেলেমেয়ের নামে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন।

স্বর্ণলতা ইতিমধ্যে বড় হোয়ে উঠেছে। একদিন বিপ্রদাসবাবু হেমের কাছে স্বর্ণর বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, গুরুদেব শ্রীরামপুরের একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু পাত্রটি আমার তেমন মনোমত নয়।

পাত্রের বিবরণ শুনে হেমচন্দ্রও আপত্তি করল। তারপর বললে, গোপালকে আপনার কেমন লাগলো।

বিপ্রদাস বললেন, খুব ভাল ছেলে, সৎ বংশ, বাঁড়ুয্যে, আমাদের পালটি ঘরও বটে। কিন্তু বড় গরীব।

হেম বললে, আপনি তো স্বর্ণকে যথেষ্ট টাকা আর সম্পত্তি দিচ্ছেন। সুতরাং তাদের অভাব থাকবে না। আমার মনে হয় স্বর্ণও খুব সুখী হবে।

বিপ্রদাস বললেন, ভেবে দেখি।

কিন্তু ভেবে দেখবার আর অবসর পেলেন না তিনি। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন।

বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে হেমচন্দ্র কলকাতায় গিয়ে বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়ল। গোপাল আর শ্যামা আহার নিদ্রা ছেড়ে হেমের শুশ্রূষা করতে লাগল এবং শ্যামার পরমার্শে গোপাল হেমের ভগ্নী স্বর্ণলতাকে পত্র লিখে দাদার অসুখের কথা জানালো।

গোপালের চিঠি পেয়ে স্বর্ণলতা আর তার ঠাকুমা অত্যন্ত চিন্তায় পড়ল। ঠাকুমা বললেন, চল, আমরা কলকাতায় যাই। কিন্তু হেমের বাসা তো চিনে যেতে পারবো না। তাই শ্রীরামপুরে

গুরুদেবের কাছে যাই। সেখান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে কলকাতা যাব।

গুরুদেবের নাম শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি। লোকটার মনে মনে মতলব ছিল, তাঁর প্রতিবেশী হরিদাসের ছেলের সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহ দিয়ে তিনি হরিদাসের কাছে থেকে মোটা টাকা আদায় করবেন। হরিদাস তাঁকে সেই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। এখন সেই সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে তিনি উল্লসিত হলেন এবং স্বর্ণলতা ও তার ঠাকুমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

স্থির হল, প্রথমেই স্বর্ণলতার কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। ঠাকুমা আগে গিয়ে দেখুন সেখানকার অবস্থা, তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

সেই পরামর্শ মতোই কাজ হল। শশাঙ্কশেখর স্বর্ণলতার ঠাকুমাকে নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। স্বর্ণ শশাঙ্কশেখরের বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর কাছে রইল।

তিন চার দিন পরে ফিরে এসে শশাঙ্কশেখর বললেন, হেম অনেকটা ভাল আছে। গোপাল নামে ছেলেটি খুব সেবা করছে। কোন ভয় নেই। ঠাকুমা শিগগিরই ফিরে আসবেন।

শুনে স্বর্ণলতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হল এবং গোপালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠল।

এদিকে শশাঙ্কশেখর চক্রান্ত করে স্বর্ণলতার বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন। জানতে পেরে স্বর্ণলতা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। শশাঙ্কশেখর তাকে বন্দী করে রাখলেন।

স্বর্ণলতার অবস্থা দেখে শশাঙ্কশেখরের ধর্মপরায়ণা স্ত্রীর মনে বেদনা জাগল। তিনি কৌশল করে স্বর্ণলতাকে দিয়ে গোপালের নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নিজেদের দাসীকে দিয়ে সেই চিঠি ডাকে ফেলিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে সেই চিঠি গোপালের হাতে পড়ল এবং গোপাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাউকে কিছু না জানিয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করল।

॥ নয় ॥

আজ স্বর্ণলতার বিবাহ। বরের বাড়ীতে মহাধূম। স্বর্ণলতা বন্ধ ঘরে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। এখনো তো কেউ কলকাতা থেকে এলো না।

রাস্তায় ইংরাজী বাজনা বাজছে। বর আসছে। শাঁক বাজল! চারিদিকে সোরগোল। বর এসে সভায় বসল। পুরোহিত এলেন। শশাঙ্কশেখর একটু আড়ালে গিয়ে হরিদাসের কাছ থেকে টাকা গুণে নিতে লাগলেন।

হঠাৎ বারবাড়িতে প্রকাণ্ড আলো দেখা গেল। শশাঙ্কশেখর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, তাঁর বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লেগেছে। তিনি পাগলের মতো সেই দিকে ছুটলেন।

আগুন, আগুন! চারদিকে গোলমাল। স্বর্ণলতার ঘরের দরজা ইতিমধ্যে শশাঙ্কশেখর খুলেছিলেন তাকে বিবাহবাসরে আনবার জন্যে। সেই খোলা দরজা দিয়ে স্বর্ণলতা ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির দরজার কাছে গিয়ে দেখল, দরজা খোলা। সে দ্রুতপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়ালো একটি স্ত্রীলোক। সে শশাঙ্ক-শেখরের বাড়ির ঝি! তাকে ধরতে এসেছে ভেবে স্বর্ণলতা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। দাসী বললে, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি তোমাকে ধরতে আসিনি। আমিও তোমার মতো পালাচ্ছি। এই দেখ, বামুনের টাকার বাক্‌স নিয়ে এসেছি।

এই বলে কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ক্যাশ বাকস বার করে দেখালো। স্বর্ণলতা বললে, তুমি কোন্ দিকে যাবে?

দাসী বললে, নদীর দিকে। নদীর ওপারে আমার এক মাসীর বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে আজ রাতটা থাকবো। তুমিও চলনা আমার সঙ্গে।

স্বর্ণলতা রাজী হয়ে তার সঙ্গ নিল।

পরদিন ভোরে গোপাল শ্রীরামপুরে পৌঁছে দেখল, শশাঙ্কশেখরের বাড়ি পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে। স্বর্ণলতাকে সে খুঁজে পেল না। পুলিস এসে পড়েছিল। তাদের মুখে শুনল, বাড়ির কর্তা আগুনে পুড়ে মারা গেছেন। অন্য আর কেউ মরেনি।

কিন্তু স্বর্ণলতা কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজি করল গোপাল। কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ হোয়ে সে নদীর ধারে গিয়ে বসল।

তার কাছ থেকে একটু দূরে কয়েকজন মাঝি বসে তর্ক বিতর্ক করছিল। গোপালকে দেখে তারা তার কাছে এলো এবং একটি আংটি গোপালের হাতে দিয়ে বললে, দেখুন তো বাবুমশায়, আংটিটার কত দাম হবে?

আংটি দেখে গোপাল চমকে উঠল। এ আংটি যে সে স্বর্ণলতার আঙুলে দেখেছে। বললে, কোথায় পেলে তোমরা এ আংটি?

একজন মাঝি বললে, কাল সন্ধ্যার পর আমি দু'জন স্ত্রীলোককে নদী পার করে দিয়েছিলাম। তাদের কাছে পয়সা ছিল না। পয়সার বদলে আমায় এই আংটি দিয়েছে।

গোপাল ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, সেই স্ত্রীলোক দু'জন কোথায় গেছে তা যদি তোমরা কেউ দেখিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমাদের পাঁচটাকা করে বকশিস দেব।

যে মাঝি স্বর্ণলতাকে পার করে দিয়েছিল সে বললে, তারা ওপারে

গিয়ে কোন্ বাড়িতে গেছে তা আমি জানি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

ওপারে গিয়ে খানিকটা পথ হেঁটে একটি বাড়ি দেখিয়ে মাঝি বললে, ওই সেই বাড়ি। আমায় বকশিস দিন।

মাঝির হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে গোপাল সেই বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ওই যে দাওয়ার উপর বসে আছে স্বর্ণলতা। তার পাশে আর একটি স্ত্রীলোক। গোপাল বলে উঠল, স্বর্ণলতা!

আবেগে আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

॥ দশ ॥

হেমচন্দ্র সুস্থ হয়ে উঠেছে, চলে ফিরে বেড়াবার শক্তি পেয়েছে। সকালে উঠে সে বারান্দায় বসে আছে, ভাবছে গোপালের কথা। কোথায় গেল সে? তিনদিন পার হয়ে গেল, কোন খবর নেই, কি হ'ল তার?

হেমচন্দ্রের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে একটি গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামল গোপাল। হেম মহানন্দে বলে উঠল, গোপাল, এসো, এসো, কোথায় ছিলে এই তিন দিন ধরে?

গোপাল কোন জবাব দেবার আগেই গাড়ীর ভিতর থেকে আরও দু'জন নামল। স্বর্ণলতা আর শশাঙ্কশেখরের ভূতপূর্ব দাসী। গোপাল তাকেও সঙ্গে এনেছিল। বলতে গেলে, সে-ই তো স্বর্ণলতাকে বাঁচিয়েছিল, চিঠিখানা সে-ই চটপট ডাকে দিয়েছিল আর তারপর স্বর্ণলতাকে পথে দেখে তাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। তাই গোপাল আর স্বর্ণলতা দু'জনেই তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করছে।

স্বর্ণলতাকে দেখে হেমচন্দ্র সবিস্ময়ে বলে উঠল, একী, স্বর্ণ, তুমি কোথা থেকে এলে ! এস, দিদি, এসো।

স্বর্ণলতা এগিয়ে এসে অশ্রুপ্লাবিত চোখে দাদাকে প্রণাম করল।

* * *

কয়েকদিন পরের কথা। গোপাল এবং হেমচন্দ্র একত্রে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ কথা বন্ধ করে হেমচন্দ্র কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল তারপর ঈষৎ হেসে বললে, গোপাল, তোমায় একটা কথা বলতে চাই।

গোপাল বললে, কি কথা ?

তোমার সঙ্গে স্বর্ণলতার বিয়ে দিতে বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল না। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এতদিনে তোমাদের বিয়ে হয়ে যেতো। বাবার হঠাৎ মৃত্যু হ'ল বলেই বিয়ের কথাটা এতদিন পাড়া হয়নি। বাবার ইচ্ছে আমি জানতাম, তাই এখন আমার কথা এই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে তোমার বাবাকে চিঠি লিখে আনিয়ে শুভকাজ শেষ করি। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছে, স্বর্ণকে তুমি গ্রহণ কর।

হেমচন্দ্রের কথা শুনে গোপালের দু'চোখ জলে ভরে গেল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'ল। বারবার চেষ্টা করেও সে কোন কথা বলতে পারল না।

হেমচন্দ্র হেসে বললে, আর তোমায় কোন কথা বলতে হবে না। আমি সব বুঝেছি। তাহলে এখনি তোমার বাবাকে চিঠি লেখা যাক ! কী বল ?

গোপাল শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

॥ এগারো ॥

গোপাল এবং স্বর্ণলতার বিবাহের পর প্রায় দু'বছর কেটে গেছে !

ইতিমধ্যে শশিভূষণের মোকর্দমার নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনি সত্য কথা বলেছেন বলে অব্যাহতি পেয়েছেন, তবে তাঁর সম্পত্তি নিঃশেষে বিক্রি করে জমিদারির তছরুপ করা টাকা মিটিয়ে দিতে হ'য়েছে। তিনি এখন ছেলে আর মেয়ে কামিনীকে নিয়ে গোপালের কাছেই আছেন। শান্তিতেই আছেন তিনি।

প্রমদা বাপের বাড়ি থাকে। কিন্তু তার ভরণ-পোষণের সব ভার গোপালকেই বহন করতে হয়। এজন্যে গোপাল তাঁকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু শশিভূষণ গোপালকে সে চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করেছেন।

বিধুভূষণ ডেপুটি কালেকটারের কাছ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতে এসে বসবাস করছেন।

অল্প বয়সেই তাঁর মাথার সব চুল শাদা হ'য়ে গেছে, তাঁকে এখন যেন শশিভূষণের চেয়ে বড় দেখায়।

স্বর্ণলতার একটি ছেলে হয়েছে। বিধুভূষণ সারাদিন নাতিকে কোলে নিয়ে খেলা দেন।

হেমচন্দ্র বছরে ছ'মাস স্বর্ণলতার কাছে এসে থাকে।

সে এলে সকলেই খুব আনন্দিত হয়। বিশেষ গোপাল আর স্বর্ণলতা। সকলেই হেমচন্দ্রকে তার মধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসে।

শ্যামা এখন এ সংসারে গৃহিণী!

স্বর্ণলতা তাকে নিজের শাশুড়ীর মতোই ভক্তি যত্ন করে।

বিধুভূষণ মাঝে মাঝে নীলকমলের কথা ভাবেন। সেই আধপাগল লোকটির উপর তাঁর অত্যন্ত স্নেহ জন্মেছিল।

তাঁরা একই সঙ্গে বহু দুঃখে অর্থ উপার্জনের আশায় বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন।

কলকাতায় প্রথম বার হারিয়ে যাবার পর আরও একবার দু'বার বিধুভূষণ নীলকমলের দেখা পেয়েছিলেন কিন্তু তাকে কাছে রাখতে পারেননি, নীলকমল প্রতিবারই কয়েকদিনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

বাড়ি এসে বসবার পর বিধুভূষণ নীলকমলকে সুখী করবার অভিপ্রায়ে নানা স্থানে তাঁর খোঁজ করেছেন। কিন্তু কোথাও আর তার দেখা পাননি।

* * *

মেঘনাথ বধ

বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক আশ্চর্য্য প্রতিভা। যেমন বিস্ময়কর তাঁর কাব্যশক্তি তেমনি বিচিত্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বিদ্রোহী তিনি জীবনে, বিদ্রোহী তিনি তাঁর রচনায়। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহী মনের পরিচয় প্রতিভাত, এই কাব্যে তিনি রামায়ণের মুখ্য চরিত্রগুলির নতুন মূল্যায়ন করেছেন। মেঘনাদ বধ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রূপে পরিগণিত।

॥ এক ॥

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে!"

রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কাপুরী আক্রমণ করেছেন। ঘোর যুদ্ধ বেধেছে। রাজসভায় স্বর্ণ সিংহাসনে লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ বসে আছেন। দ্বারদেশে রক্ষী স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বহু পাত্র-মিত্র নতমস্তকে বসে আছেন। সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে কিংকরীর দল চামর দোলাচ্ছে। ছত্রধর রাজার মাথায় হেমছত্র ধরে আছে।

রাজার সামনে করজোরে দাঁড়িয়ে আছে মকরক্ষ নামে একজন ভগ্নদূত। সে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এনেছে। রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

এই সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রাবণ বললেন, রে দূত! তোর সংবাদ যেন রাত্রের স্বপ্নের মতো!

যার বিক্রমে দেবতারা পর্যন্ত পরাস্ত হোত, তাকে ভিখারী রাম যুদ্ধে বধ করল!

রাবণের মনে হল, এই কাল-মহাসমরে বুঝি রক্ষা নেই, বুঝি রাম তাঁকে শেষ পর্যন্ত সবংশে নিধন করবেন!

তা নাহলে, কুম্ভকর্ণের মতো অপরাজেয় বীরশ্রেষ্ঠ ভাই কি মারা পড়ত?

রাবণের আরও মনে হল, অগ্নিশিখারূপিনী সীতার জন্যই আজ সোনার লঙ্কা পুড়ে ছারখার হোয়ে যাচ্ছে, একে একে দীপমালা নিভছে, সব অন্ধকার হোয়ে আসছে।

রাবণের বুক চিরে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। তাঁর ইচ্ছা করতে লাগল, কনকলঙ্কা ছেড়ে নিবিড় অরণ্যে গিয়ে বিরলে বসে তিনি মনের জ্বালা জুড়োবেন।

মহাবলী রাবণের অবোধ প্রাণ আজ আর কোন সান্ত্বনাই মানছে না। মন বারবার মৃত পুত্রের কথা শোনবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠছে।

ভগ্নদূত যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল। কী অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গেই না বীরবাহু যুদ্ধ করেছে। কেউই তার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। সবাই তার বিক্রমে রণে ভঙ্গ দিচ্ছিল। অবশেষে স্বয়ং রামচন্দ্র তাকে আক্রমণ করলেন। সেই প্রচণ্ড আক্রমণ বীরবাহু প্রতিশোধ করতে পারল না। সম্মুখ-যুদ্ধে অশেষ বীরত্বের সঙ্গে রাবণ-তনয় বীরবাহু গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছে।

ক্ষাত্র গর্বে রাবণের বুক ফুলে উঠল। অমাত্যদের নিয়ে প্রাসাদ শিখরে উঠে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দর্শন করলেন। দেখলেন রামচন্দ্রের অসংখ্য সৈন্য লঙ্কাপুরী ঘিরে ফেলেছে। পূর্বপ্রান্তে নীল, দক্ষিণে অংগদ, উত্তরে সুগ্রীব এবং পশ্চিম দিকে স্বয়ং রামচন্দ্র। তাঁর পাশে লক্ষ্মণ, হনুমান এবং বিভীষণ।

গভীর অরণ্যে ব্যাধেরা যেমন সকলে মিলে সিংহীকে বেড়াজালে আবদ্ধ করে তেমনি ভীষণ শত্রুর দল আজ লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের চারধারে অগণিত মৃতদেহ।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখে রাক্ষসরাজ বিচলিত বোধ করলেন। ধীরে ধীরে প্রাসাদ শিখর থেকে নেমে আবার সভাগৃহে এসে বসলেন। মহাশোকে সারা সভাস্থল স্তব্ধ।

সহসা সেই স্তব্ধতার বুক ভেদ করে শোনা গেল এক মায়ের করুণ কান্না।

আলুথালু বেশে সভায় এসে দাঁড়ালেন বীরবাহুর মা, রাণী চিত্রাঙ্গদা। রাবণের কাছে গিয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, বিধাতা আমায় একটি মাত্র রত্ন দিয়েছিলেন, আমি দীনা, সেই রত্নটিকে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম। বল, সে কোথায়?

রাবণ কি উত্তর দেবেন? শুধু বললেন, রাণী, আজ লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করবার জন্যে স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁর হাত বাড়িয়েছেন।

চিত্রাঙ্গদা বললেন, কেন এই যুদ্ধ? কেন এই সর্বনাশ? রামচন্দ্র তো সাধ করে যুদ্ধ করতে আসেননি।

এই বলে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন।

শোকে, ক্ষোভে, অভিমানে রাবণের অন্তর ফুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন, তিনি নিজেই যুদ্ধে যাবেন। বললেন, এ পৃথিবীতে রাম এবং রাবণ দু'জনের স্থান নেই। সুতরাং আজ এই পৃথিবী অ-রাবণ বা অ-রাম হবে।

ওদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রকে নিজের হাতে বধ করেছেন এই বিশ্বাস নিয়ে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ মহানন্দে প্রমোদ কাননে গিয়েছেন।

কিন্তু সহসা এ কী দুঃসংবাদ!

রাম মরেন নি? তিনিই তাঁর প্রিয় ভাই বীরবাহুকে হত্যা করেছেন?

এই সংবাদ শুনে ইন্দ্রজিৎ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। স্ত্রী-প্রমীলা কাতর হোয়ে পড়েছিলেন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তিনি এখনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেন। শত্রুকে বিনাশ করে শিগগিরই আবার ফিরে আসবেন।

প্রমোদকানন থেকে ইন্দ্রজিৎ গেলেন পিতার কাছে এবং যুদ্ধে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

ক্ষণেকের জন্য রাবণের বুক কেঁপে উঠল। তবুও পুত্রের প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করলেন। বললেন, যদি তোমার যুদ্ধে যেতে একান্ত ইচ্ছা, তাহলে যুদ্ধে যাও। কিন্তু তার আগে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, ইষ্টদেবের পূজা কর। তোমাকে আমি সেনাপতি পদে বরণ করলাম। সন্ধ্যা হোয়ে এলো। কাল সকালে তুমি যুদ্ধযাত্রা করো।

॥ দুই ॥

প্রমোদ কাননে বসে প্রমীলা ইন্দ্রজিতের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হোয়ে উঠেছেন। রাত হল, এখনো তিনি ফিরছেন না কেন? সখীদের বললেন, চল, সকলে মিলে গিয়ে দেখি।

প্রমীলার কথায় তাঁর প্রিয় সখী বাসন্তী বললে, কিন্তু প্রমোদ কানন থেকে প্রাসাদে যাবে কেমন করে? রাঘবের সেনাদল লঙ্কাপুরীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে? কেমন করে অবরুদ্ধ প্রাসাদে ঢুকবে?

তার কথা শুনে ক্রোধভরে প্রমীলা বললেন, তুই কি বলছিস

বাসন্তী! পর্বত গুহা ছেড়ে নদী যখন সাগরের উদ্দেশ্যে বেরোয় তখন কার হেন সাধ্য যে তার গতি রোধ করে!

প্রমীলা ভয় পাবার মেয়ে নন, বললেন:

দানব নন্দিনী আমি রক্ষকুল বধূ
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই সখী, ভিখারী রাঘবে?

দলবল নিয়ে বীরাঙ্গনা সাজে ঘোড়ার পিঠে চেপে প্রমীলা প্রমোদ-কানন থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

রামচন্দ্র সসম্মানে তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন। প্রমীলা নির্বিঘ্নে প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করলেন।

॥ তিন ॥

লঙ্কাপুরীতে আজ মহোৎসব, দরজায় দরজায় মালা ঝুলছে, জানালায় আলো জ্বলছে, বাড়ির ছাদে পতাকা উড়ছে। মহা কলরব তুলে রাজপথ প্লাবিত করে জনস্রোত চলেছে। সকলেরই বুকে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা। আজ ইন্দ্রজিৎ সসৈন্যে রামচন্দ্রকে নিধন করবেন। রাজদ্রোহী বিভীষণ শাস্তি পাবে। স্বর্ণলঙ্কা নিষ্কণ্টক হবে।

এই আনন্দমগ্ন লঙ্কাপুরীর এক নিভৃত প্রান্তে অশোকবনের অন্ধকার কুটিরে সীতাদেবী একা বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন।

দুরন্ত চেড়ীর দল, যারা তাঁকে অষ্টপ্রহর পাহারা দেয়, তারা আজ তাঁকে ছেড়ে উৎসবে মত্ত হয়েছে।

সীতার প্রাণের বেদনা যেন অশোক কাননের পাতায় পাতায় মর্মরিত হচ্ছে, যেন তাঁরই শোকে রাশি রাশি ফুল ঝড়ে পড়ছে।

রাক্ষসপুরীতে একজন ছিলেন সীতার ব্যথার ব্যথী। তিনি বিভীষণের স্ত্রী—সরমা। তিনি এসে সীতার পায়ের কাছে বসলেন। কৌটা খুলে সযত্নে সীতার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন।

সরমা সীতার কাছে এসে তাঁর অপূর্ব জীবন-কথা শুনে সান্ত্বনা পান। সীতার স্বয়ম্বরের কথা আগেই শুনেছেন। আজ সীতা-হরণের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

সীতা বলতে লাগলেন: গোদাবরী নদীর ধারে কপোত-কপোতীর মত আমরা পরম সুখে ছিলাম। ভোরবেলা পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙতো। পদ্মফুল তুলে চুলে পরতাম। সরোবরের স্বচ্ছ জলে মুখ দেখতাম। আঙিনায় ময়ুর-ময়ূরী, হরিণ-হরিণীর দল বেড়াতে আসতো।

পঞ্চবটী বনে এসে আগেকার জীবনের কথা ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম, আমি রাজবধূ, রাজনন্দিনী। কখনো পাহাড়ের চূড়ায় উঠে স্বামীর কাছে বসতাম, আবার কখনো নদীর তীরে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে ফুলের সাজে নিজেকে সাজাতাম। তাই দেখে প্রভু হাসতেন, বলতেন, আমি যেন 'বনদেবী'।

বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

একটু পরে আবার বলতে শুরু করলেন: তারপর এল দুষ্ট সূর্পণখা। সেই থেকে আমার জীবনে অশুভ ছায়া পড়ল।

মায়া-মৃগের চক্রান্ত-জাল ফেলে এলো মারীচ রাক্ষস। আমার অনুরোধে স্বয়ং রাঘব সেই স্বর্ণমৃগকে ধরতে ছুটে গেলেন।

তারপর হঠাৎ শোনা গেল আর্তনাদ: 'রক্ষা কর, লক্ষ্মণ, আমায় রক্ষা কর।' প্রভুর কণ্ঠস্বর।

লক্ষ্মণ ছিল দ্বারী। আমি জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিলাম। পরক্ষণেই কুটিরের দরজায় এসে দেখা দিল এক সন্ন্যাসী। শিরে জটা, হাতে কমণ্ডলু। সে ভিক্ষা চাইল। আমার গণ্ডীর বাইরে যেতে

মানা। কিন্তু এদিকে অতিথি ফিরে যায়। তাই যেমন গণ্ডীর বাইরে পা বাড়িয়েছি, অমনি দেখি, কোথায় সে সন্ন্যাসী! এ যে রাক্ষস রাবণ।

নিমেষের মধ্যে রাবণ আমায় রথে তুলে নিল। তারপর সেই রথ আকাশপথে ছুটে চলল। পশু-পাখী, তরুলতা, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত সবাইকে আমার বিপদের কথা জানালাম।

পথে বীর জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করল। কিন্তু রাবণ জটায়ুর পাখা কেটে ফেললো।

রথ চলতে লাগল, ক্রমে নীচে দেখা দিল নীল সমুদ্রের ঢেউ-এর মালা। রথ লঙ্কায় এসে পৌঁছলো। তারপর থেকে এই বনে আমি বন্দিনী।

কথা শেষ করে সরমার গলা ধরে সীতা কাঁদতে লাগলেন। সরমাও কাঁদলেন। হঠাৎ অদূরে চেড়ীদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা ফিরে আসছে।

ভীতা হরিণীর মতো সরমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন।

॥ চার

লঙ্কার উত্তর প্রান্তে গভীর অরণ্যের মধ্যে চণ্ডীর মন্দির।

লক্ষ্মণ সেই মন্দিরের উদ্দেশ্যে চলেছেন।

নিঝুম রাত।

লক্ষ্মণ একাই যাচ্ছেন। চণ্ডীর পূজা দিতে পারলেই ইন্দ্রজিৎ নিধনে তিনি নির্ভয় হবেন।

পথে দাঁত কড়মড় করে পুচ্ছ নাচিয়ে এক রক্তচক্ষু সিংহ তাঁকে

আক্রমণ করল। কিন্তু লক্ষ্মণ নির্ভয়ে তরবারী তুলতেই মায়া-সিংহ অদৃশ্য হল।

তারপর শুরু হয় ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ। গাছপালা উপড়ে পড়ল। দাবানল জ্বলে উঠল। সারা পৃথিবী যেন এখনি ধ্বংস হবে। কিন্তু লক্ষ্মণ অচল-অটল পর্বতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঝড়ের মায়া মিলিয়ে গেল।

তারপর ক্রমে মধুর সৌরভে বনবনান্ত ভরে উঠল, আকাশে-বাতাসে মধুর সুর। সামনেই দেখা দিল চণ্ডীর দেউল।

মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে লক্ষ্মণ মায়ের প্রসাদ লাভ করলেন। পাখীর কলকাকলীতে বনভূমি মুখরিত হল।

এদিকে রাজপ্রাসাদে মেঘনাদের শয়নকক্ষে ভোর হল।

লঙ্কাপুরীতে রণদামামা বেজে উঠল। ঘরে ঘরে পথে পথে শোনা যেতে লাগল, 'জয় মেঘনাদ'।

প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ মা মন্দোদরীকে প্রণাম করলেন, মায়ের আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ হলেই মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রা করবেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল। যুদ্ধ থেকে ছেলে যদি আর ফিরে না আসে!

জননীর পদ-বন্দনা করে ইন্দ্রজিৎ চলে গেলেন। রাণী পুত্রবধূকে নিয়ে নিজের মহলে প্রবেশ করলেন।

কিছুদূর গিয়ে শিবিকা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে ইন্দ্রজিৎ একাকী পদব্রজে কাননের মধ্যে যজ্ঞশালা অভিমুখে এগিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

রামচন্দ্র আজ বড় উদ্বিগ্ন।

ভয়ংকর যুদ্ধ হবে আজ।

তাঁর মনে পড়ছে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের জীবন-কথা। পিতামাতা, স্ত্রী, পরিজন এবং রাজপ্রাসাদের সুখশান্তি ছেড়ে লক্ষ্মণ তাঁর সঙ্গে এসেছেন, ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘুরছেন। তাই আজ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পাঠাতে রামচন্দ্রের অন্তর ব্যথায় ভরে উঠেছে।

এদিকে মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অদৃশ্যমান হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অদূরে দেখা দিল নিকুম্ভিলা যজ্ঞশালা।

যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ কুশাসনে ধ্যানে বসেছেন। গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পরণে রক্তাম্বর।

সুরভিত ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। যথাস্থানে সাজানো হয়েছে পুষ্পপাত্র, হেমঘণ্টা, কোশাকুশি। তাদের মাঝখানে ইন্দ্রজিৎকে দেখাচ্ছে যেন মহাদেবের মত।

ক্ষুধাতুর বাঘ যেমন গো-শালায় প্রবেশ করে, লক্ষ্মণও তেমনি যজ্ঞশালায় ঢুকলেন।

বীরপদভরে যজ্ঞমন্দির প্রকম্পিত হল।

চমকে চোখ মেলে ইন্দ্রজিৎ দেখলেন, সামনেই তাঁর আরাধ্য দেবতা। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ 'যুদ্ধং দেহী' বলে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন।

ইন্দ্রজিতের ভুল ভাঙলো। তিনি তখন লক্ষ্মণকে ক্ষাত্রধর্ম স্মরণ করে অস্ত্র নিয়ে আসার অনুমতি চাইলেন। ইন্দ্রজিৎ নিরস্ত্র এবং নিরস্ত্রের গায়ে অস্ত্রাঘাত তো কাপুরুষের ধর্ম।

কিন্তু লক্ষ্মণ আজ অত ধর্মাধর্ম বুঝতে চান না। বাঘকে খাঁচায় পেলে কেউ কি ছেড়ে দেয়?

ক্রোধে ও ঘৃণায় ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে হীন কাপুরুষ বলে ধিক্কার দিতে দিতে কোশা তুলে প্রচণ্ডবেগে লক্ষ্মণের মাথায় ছুঁড়ে মারলেন।

সেই আঘাতে লক্ষ্মণ মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন ইন্দ্রজিৎ তাঁর অস্ত্র আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মায়াদেবীর চক্রান্তে বিফল হলেন।

দরজার কাছে যেতেই ইন্দ্রজিৎ দেখলেন, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর কাকা বিভীষণ।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝলেন, কোন্ গৃহশত্রু আজ চোরকে সিঁদ কেটে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছে।

ইন্দ্রজিৎ তখন রক্ষোবংশের নাম করে, বিভীষণের মায়ের নাম করে তাঁকে দরজা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন।

কিন্তু বিভীষণ দরজা ছাড়লেন না, জানালেন, তিনি রাঘবের দাস, ধর্মের পথ তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না।

তাঁর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ গর্জে উঠে বললেন:

কোন্ ধর্মমতে…
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে
দিলা জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ…

এদিকে লক্ষ্মণ চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ধনুকে টংকার দিলেন। তীক্ষ্ণ শরাঘাতে নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের দেহ থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে লাগল। উন্মত্তের মত ইন্দ্রজিৎ শাঁখ, ঘণ্টা, পাত্র, প্রদীপ, হাতের কাছে যা পেলেন তাই ছুঁড়ে লক্ষ্মণকে মারতে লাগলেন।

কিন্তু মায়াদেবী অদৃশ্য হাতে প্রত্যেকটি আঘাত থেকে লক্ষ্মণকে রক্ষা করলেন।

ইন্দ্রজিৎ সিংহ-গর্জনে লক্ষ্মণের দিকে ধেয়ে গেলেন। কিন্তু মায়ার বলে মাঝপথেই স্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই সুযোগে লক্ষ্মণ দেবদত্ত মহা অস্ত্র ছুঁড়তেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হলেন।

অমনি থরথর করে পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্র গর্জন করতে লাগল, রাজসভা মধ্যে রাবণের মাথা থেকে মুকুট খসে পড়ল, আচম্বিতে রাণী মন্দোদরী মূর্চ্ছিতা হলেন, প্রমীলা আপন ভুলে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন, কোলের শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল।

এইভাবে লঙ্কার পঙ্কজ রবি অস্তাচলে গেল।

॥ ছয় ॥

রাবণ রাজসভায় প্রবেশ করে সিংহাসনে বসেছেন এমন সময় দূত এসে সেই নিদারুণ সংবাদ জানালো—বীর মেঘনাদ নিহত হয়েছেন।

গভীর অরণ্যে পশুরাজ সিংহকে দুরন্ত ব্যাধ কালশরে বিঁধলে সিংহ যেমন গর্জন করে আছড়ে পড়ে, রাবণও তেমনি আর্তনাদ করে সিংহাসন থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন।

হায় হায় করে মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে ধরল।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উঠে দাঁড়িয়েই রাবণ বললেন, এবার তিনি রণরঙ্গে মেতে প্রাণের জ্বালা জুড়োবেন, তিনি যুদ্ধে যাবেন।

দিকে দিকে সাজ সাজ রব উঠল। সৈন্যদের পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করতে লাগল। পথে পথে পতাকা উড়তে লাগল।

ভীষণ সমরক্ষেত্র।

রাবণ যুদ্ধে এসে আজ রামচন্দ্রকে চান না। তিনি চান লক্ষ্মণকে। কোথায় সেই পুত্রহন্তা কাপুরুষ?

পথের মাঝখানে সুগ্রীব বাধা দিতে গিয়ে আহত হল।

রাবণের সেই ভয়ঙ্কর রণমূর্তি দেখে রঘুসৈন্য পালাতে লাগল।

সহসা সামনেই লক্ষ্মণকে দেখতে পেলেন রাবণ। আর যায় কোথায়! ইন্দ্রজিতের নাম স্মরণ করে রাবণ ভীমবেগে শক্তিশেল নিক্ষেপ করলেন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

লক্ষ্মণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

রাঘব-শিবিরে হায় হায় রব উঠল।

জয়ের আনন্দে আত্মহারা হোয়ে রাবণ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। চারিদিকে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। আজ মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, সেই আনন্দে রাক্ষসকুল উল্লসিত হল।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আকাশে মুঠো মুঠো তারা ফুটে উঠেছে।

রণক্ষেত্রেরর মাঝখানে মৃত লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে রামচন্দ্র বসে আছেন।

তাঁর পাশে বিভীষণ, অংগদ, হনুমান, নল, সুষেণ, সুবাহু, সুগ্রীব প্রভৃতি সেনাপতিবৃন্দ।

সকলেই বিষণ্ণ। সকলেই শোকে মুহ্যমান।

প্রাণের ভাই লক্ষ্মণের শোকে রামচন্দ্র ভেঙে পড়েছেন। পাগলের মত বিলাপ করছেন। লক্ষ্মণকে সঙ্গে না নিয়ে তিনি কোন্ মুখে জননী সুমিত্রার কাছে ফিরে যাবেন? নববধূ উর্মিলাকেই বা কি বলে বোঝাবেন?

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর মহাবীর হনুমান মহৌষধির পাহাড় বহন করে নিয়ে এল।

সেই ওষুধ খেয়ে লক্ষ্মণ বেঁচে উঠলেন।

রামচন্দ্রের শিবিরে মহা আনন্দ কলরব জেগে উঠল।

॥ আট ॥

প্রাসাদ-কক্ষে বসে রাবণ সেই আনন্দ কোলাহল শুনলেন।

লক্ষ্মণ বেঁচে উঠেছে? যা হবার নয় তাই হয়েছে? বুঝলেন, এই দুর্ধর্ষ শত্রুর অসাধ্য কিছু নেই।

রাবণ ইন্দ্রজিতের শেষকৃত্য সমাপনের জন্য সাত দিনের যুদ্ধ-বিরতি প্রার্থনা করে রামচন্দ্রের কাছে আবেদন পাঠালেন।

রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। সাত দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হল।

লঙ্কার রাজপথে সারিবদ্ধ জনতা নীরবে চলেছে। শোকযাত্রার পুরোভাগে হাতীর পিঠে ইন্দ্রজিতের শবদেহ।

প্রমীলা চলেছেন পিছনে। তাঁর কপালে সিঁদুর, গলায় মালা, হাতে কঙ্কন।

লঙ্কার পুরবাসীরা পথে পথে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছে, কেউ বা হাহাকার করে কাঁদছে।

এই দৃশ্য দেখে রাবণ আপন বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন।

সমুদ্রতীরে সুগন্ধ চন্দন কাঠের চিতা সাজানো হল। রক্ষ-পুরোহিতগণ মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

সমুদ্রে স্নান করে এসে প্রমীলা গায়ের সব অলঙ্কার খুলে বিলিয়ে দিলেন। গুরুজনদের প্রণাম করলেন। সখীদের মধুর কথায় সম্ভাষণ জানালেন। তারপর হাসিমুখে স্বামীর পাশে চিতায় উঠে বসলেন।

রাবণ চিতার কাছে গিয়ে আপন মনে বললেন, মেঘনাদ, বড় আশা ছিল, শেষ সময়ে তোমার সামনে আমি দু'চোখ বুজবো, তোমার হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে মহাযাত্রা করব। কিন্তু বিধির লীলা বুঝবো কেমন করে? সে সুখ তিনি আমার দিলেন না।

চিতা জ্বলে উঠতেই সকলে অবাক হয়ে দেখল, আকাশপথে দিব্য রথে চড়ে ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা চলে যাচ্ছেন।

দুধের ধারায় চিতা নেবানো হল। সকলে মুঠো মুঠো ভস্ম কুড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। তারপর সাগর জলে স্নান করে লঙ্কার নরনারী অশ্রুসজল চোখে ঘরে ফিরে গেল।

করি স্নান সিন্ধু নীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে॥

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত

রমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে পরিগণিত। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে তিনি শিবাজীর যে মহান চরিত্র অঙ্কিত করেছেন, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবা'র জন্যে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকৃতির যে বাণী আর আদর্শের রূপায়ণ করেছেন তা যেমন প্রেরণাদায়ক তেমনি রোমাঞ্চকর।

॥ এক ॥

বসন্তের সন্ধ্যা।

অকালে বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টির মধ্যে কংকন জনপদের এক পাহাড়ঘেরা পথ দিয়ে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে চলেছেন। বছর আঠারো কুড়ি তাঁর বয়স। পরনে রাজস্থানী পোষাক। নাম রঘুনাথজী হাবিলদার। তাঁর গন্তব্যস্থল অনতিদূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত এক দুর্গ।

পার্বত্যদুর্গে পৌঁছে রঘুনাথজী কিল্লাদারের মহলে গিয়ে হাজির হলেন। কিল্লাদার ছিলেন শিবাজীর বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁর সঙ্গে দেখা করে রঘুনাথ তাঁর হাতে কয়েকটি লিপি দিলেন। লিপি পাঠিয়েছেন শিবাজী। তার মধ্যে দিল্লীর সম্রাট আওরংজেবের সঙ্গে শিবাজীর যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের ব্যবস্থা, কিভাবে কিল্লাদার শিবাজীর সহায়তা করবেন, এইসব নির্দেশ লেখা ছিল।

লিপিগুলি পড়ে কিল্লাদার বললেন, রঘুনাথজী হাবিলদার, তুমি যে এত তাড়াতাড়ি সিংহগড় থেকে এখানে আসতে পারবে তা

ভাবিনি। যাইহোক, আজ তুমি এখানেই থাকো। কাল সকালে আমি আমার উত্তর তৈরী করে রাখবো।

কিল্লাদারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রঘুনাথ সে রাতের মতো সেই দুর্গেই রইলেন। পরদিন ভোরবেলা তিনি ভবানী দেবীর মন্দিরের দিকে গেলেন। শিবাজী এই মন্দিরে নিয়মিত পূজা দিতেন।

মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখলেন, একটি কিশোরী মন্দির সংলগ্ন বাগানের ভিতর ফুল তুলছে। বালিকা বোধহয় রাজপুত। বয়স বছর তেরো। ভারী সুশ্রী আর লাবণ্যময় তার চেহারা। দেখে মুগ্ধ হলেন রঘুনাথ।

মেয়েটির নাম সরযূ। মন্দিরের পুরোহিত রাজপুত ব্রাহ্মণ জনার্দন দেব বাপ মা মরা মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করছিলেন।

রঘুনাথ জনার্দন দেবকে প্রণাম করলেন, পূজা দিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে দুর্গে ফিরে গেলেন।

॥ দুই ॥

শিবাজীর প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ছিল। সম্রাট আওরংজেব প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু শিবাজীর বহু দুর্গজয়ের কাহিনী শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁকে দমন করবার জন্যে পরাক্রমশালী সেনানায়ক সায়েস্তা খাঁকে নিযুক্ত করলেন।

সায়েস্তা খাঁ মহারাষ্ট্রে এসে অল্পদিনের মধ্যেই পুনা, চাণক দুর্গ এবং অন্যান্য জায়গা অধিকার করে নিলেন।

শিবাজী দেখলেন, বিপদ ক্রমেই বাড়ছে। সায়েস্তা খাঁ পুনা নগরের কাছে সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং শিবাজীর কোন কূটকৌশল যাতে না খাটে সেজন্যে আদেশ জারী করেছেন যে, অনুমতি পত্র ছাড়া কোন মারাঠা পুনা নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। চারিদিকে তাঁর সতর্ক প্রহরীরা ঘুরতে লাগল। শিবাজী দেখলেন, সোজা রাস্তায় সায়েস্তা খাঁকে সায়েস্তা করা যাবে না। তিনি ফন্দী খুঁজতে লাগলেন।

এক বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রীদল পুনার প্রান্ত থেকে নগরের ভিতর প্রবেশ করবার অনুমতি পেয়েছিল। গভীর রাত্রে বিবাহ। রাত একটার সময় সেই বরযাত্রী দল নগরে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে বহু বাজনদার। তারা সজোরে বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলল।

শিবাজী বরকর্তার সঙ্গে যোগ সাজস করে, তন্নজী, যশজী, রঘুনাথ হাবিলদার এবং পঁচিশজন মাত্র মাউলী সৈন্য নিয়ে পথের ধারে এক বাগানের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বরযাত্রীর দল সামনে আসতেই তাঁরা নিঃশব্দে সেই বরযাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেলেন। কেউ কিছুই বুঝতে পারল না।

বরযাত্রীরা সায়েস্তা খাঁর বাসস্থানের কাছ দিয়ে চলে গেল। কেউ জানতে পারল না, বরযাত্রীদের মধ্যে জন তিরিশেক লোক সরে এসে সায়েস্তা খাঁর বাসভবনের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে নামল।

রাত আরও গভীর হল।

সহসা একটা ঘরের মেয়েদের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে যেন কিসের শব্দ! মানুষের চলাফেরার আওয়াজ। একটা জানলা খুলে তারা দেখল, বহু মারাঠা সৈন্য বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে। তারা আতংকে চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকারে সায়েস্তা খাঁর সুখনিদ্রা ছুটে গেল। দরজা খুলে

দেখলেন, চতুর্দ্দিকে কোলাহল, ছুটোছুটি, বিশৃংখলা। আরও শুনলেন, শিবাজী তাঁর বাসভবন আক্রমণ করেছেন।

প্রাসাদ রক্ষীদের সঙ্গে মাউলী সৈন্যদের তুমুল লড়াই হোয়ে গেল। প্রাসাদ রক্ষীরা কতক মারা পড়ল, কতক প্রাণ ভয়ে পালালো।

সেই সংঘর্ষের সময় শিবাজী যখন সায়েস্তা খাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় সায়েস্তা খাঁর এক সেনানায়ক পিছন থেকে শিবাজীকে মারবার জন্যে তলোয়ার ওঠালো। চমকে উঠে শিবাজী ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনেই মাথার উপর উদ্যত খড়্গ, এ যাত্রা বুঝি আর রক্ষা নেই!

সহসা একটা বর্শা এসে সেনানায়কের বুকে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শিবাজী দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রঘুনাথজী হাবিলদার। তার হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শায় শিবাজী সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলেন। রঘুনাথকে জড়িয়ে ধরলেন শিবাজী।

এদিকে সায়েস্তা খাঁ আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে কোন ক্রমে ঘরের জানলা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেলেন। তবে একেবারে অক্ষত অবস্থায় পালাতে পারলেন না। জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার সময় একজন মাউলী সৈন্যের তলোয়ারের আঘাতে তাঁর ডানহাতের একটি আঙুল কেটে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে ক্রুদ্ধ মোগল সৈন্য প্রবল বিক্রমে সিংহগড় আক্রমণ করল। কিন্তু গড়ের কামানের গোলার মুখে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

সায়েস্তা খাঁর শোচনীয় পরাজয়ে আওরংজেব বিষম ক্রুদ্ধ এবং বিচলিত হলেন। পুত্র সুলতান মোয়াজিম ছিল যুদ্ধবিশারদ। তাকে পাঠালেন শিবাজীকে শিক্ষা দিতে। কিন্তু মোয়াজিম শিবাজীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই শিক্ষা পেয়ে ফিরে এলো। অবশেষে সম্রাট তাঁর শ্রেষ্ঠ সহায় ও মহাপরাক্রমশালী অম্বররাজ জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করবার ব্যবস্থা করলেন।

রাজা জয়সিংহ শুধু যে একজন শ্রেষ্ঠ রণকুশলী সেনাপতি ছিলেন তাই নয়। তিনি ছিলেন দূরদর্শী, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ। মানীর মান রাখতে তিনি জানতেন। তিনি শিবাজীর প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা পোষণ করতেন।

শিবাজী রাজা জয়সিংহের প্রতাপ ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। বুঝলেন, তাঁর মত প্রবল প্রতাপ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ফললাভ হবে না। হবে শুধু লোকক্ষয়। তাই তিনি জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

সন্ধির পর জয়সিংহ বিজাপুর রাজ্য অধিকার করবার উদ্যোগ করলেন এবং এই কাজে শিবাজী তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

পর পর অনেকগুলি দুর্গ জয় হয়। তারপর শিবাজী স্থির করলেন, বিজাপুরের অধীনস্থ পার্বত্য দুর্গ 'রুদ্রমণ্ডল' আক্রমণ করবেন তিনি কবে কোনস্থানে হানা দেবেন তা আগে কাউকে বলতেন না। এবারও বললেন না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক হাজার মাউলী আর মারাঠা সৈন্যকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন। তারপর রাত একপ্রহরের সময় জানালেন 'রুদ্রমণ্ডল' দুর্গ আক্রমণ করা হবে।

সেই পর্বত চূড়ায় অবস্থিত দুর্গে ওঠবার একটিমাত্র পথ। অন্য পথ যা আছে তা অত্যন্ত দুর্গম। শিবাজী আদেশ দিলেন—ওই দুর্গম পথ দিয়েই দুর্গ আক্রমণ করা হোক।

কিন্তু এ কী ব্যাপার! কিছুদূর উঠেই সৈন্যরা দেখল, দুর্গ প্রাচীরে মশাল জ্বলছে। অর্থাৎ শত্রুরা তৈরী হোয়ে অপেক্ষা করছে। শিবাজী বিস্মিত হলেন। তাঁর এই গোপন অভিযানের কথা শত্রুপক্ষ জানল কেমন করে?

শিবাজী তখন শত্রুকে ভোলাবার জন্যে একশো সৈন্যকে দুর্গের অপরদিকে গিয়ে কোলাহল করতে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেদিকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। শত্রুরা ভাবল, সেইদিক থেকেই দুর্গ আক্রান্ত হয়েছে। তারা সেইদিকে ছুটল।

শিবাজী তখন বাকী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তাঁর গতি শত্রুদের অজানা রইল না। তারা মার মার শব্দে ছুটে এলো। দুই দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধলো, বৃষ্টির ধারার মত চারিদিক থেকে তীর আর বর্শা নিক্ষিপ্ত হোতে লাগল। 'হর হর মহাদেও' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে পর্বতশীর্ষ প্রকম্পিত হল।

সহসা শোনা গেল 'মহারাজ শিবাজী কি জয়'।

পরম বিস্ময়ে সকলে দেখল, শত্রুব্যূহ ভেদ করে একজন রক্তাপ্লুত-দেহ রাজপুত পাঁচীলের উপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলে চিনতে পারল—রঘুনাথজী হাবিলদার।

সেই দৃশ্য দেখে শিবাজীর সৈন্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ চালালো এবং উপরে উঠে দুর্গ দখল করে নিল।

॥ চার ॥

পরদিন বিকালে রুদ্রমণ্ডল দুর্গে এক সভা বসল। চাঁদোয়ার নীচে রাজাসনে রাজা জয়সিংহ ও মহারাজা শিবাজী। চারিদিকে বিশিষ্ট সেনানায়কবৃন্দ। আশে পাশে সশস্ত্র সিপাহীর দল।

শিবাজীর আদেশে যুদ্ধবন্দীদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হল। রুদ্রমণ্ডল গড়ের কিল্লাদার বৃদ্ধ রহমৎ খাঁকে শিবাজী বিশেষ সম্মান দেখালেন। তাঁর উদার ব্যবহারে অভিভূত রহমৎ খাঁ বললেন, ক্ষত্রিয়রাজ, আপনার ব্যবহারে আমি বিস্ময় বোধ করছি। কিছু বলবার নেই, শুধু একটা কথা জানাবার আছে। কাল আপনি যে আমার দুর্গ আক্রমণ করবেন এ সংবাদ আমি আগেই পেয়েছিলাম। সেইজন্যে সৈন্য প্রস্তুত করতে পেরেছিলাম। আপনার একজন সেনা আমাদের এই খবর দেয়।

তাঁর সেনা বিশ্বাসঘাতক! শিবাজী রাগে কাঁপতে লাগলেন। কে এই বিশ্বাসঘাতক? সৈন্যদের নানা প্রশ্ন করা হল। জানা গেল, সৈন্যরা দুর্গ আক্রমণের হুকুম পেয়েছিল রাত এক প্রহরে। অভিযান শুরু হয় দেড় প্রহরে। সেই সময়ের মধ্যে কেউ কি অনুপস্থিত ছিল শিবাজীর শিবিরে? চন্দ্ররাও নামে জুমলাদার এগিয়ে এসে বললে, সেই সময় একজন হাবিলদার শিবিরে ছিল না।

শিবাজী গর্জন করে উঠলেন, কে সে?

চন্দ্ররাও বললে, রঘুনাথজী হাবিলদার!

রঘুনাথ! তুমি, বিশ্বাসঘাতকতা করেছো! শিবাজী ভীষণ উত্তেজিত!

রঘুনাথ উত্তর দিলেন, প্রভু, আমি নির্দোষ!

তবে কি কারণে আমার আদেশ লংঘন করে তুমি যুদ্ধযাত্রার সময় অনুপস্থিত ছিলে? পাপিষ্ঠ! কাল বীরত্ব দেখিয়েছিলে। সে তোমার কপট আচরণ। আমার হাতে বিশ্বাসঘাতকের নিস্তার নেই। আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আমি নিজের হাতে তোমাকে বধ করব।

এই বলে শিবাজী তলোয়ার বার করলেন। রাজা জয়সিংহ শিবাজীর হাত ধ'রে বললেন, ক্ষত্রিয়রাজ, ভাল মত সব দিক বিবেচনা না করে এমন কাজ করবেন না। আমার মনে হচ্ছে, এই রাজপুত যোদ্ধা বিদ্রোহী বা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাই হোক, আমি এর প্রাণভিক্ষা চাইছি। আমায় ভিক্ষা দান করুন।

শিবাজী বললেন, মহান রাজা জয়সিংহ। আপনার কথা অমান্য করব না।

রঘুনাথের দিকে ফিরে বললেন, হাবিলদার, রাজা জয়সিংহের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হল। কিন্তু তুমি আমার সামনে থেকে দূর হও। তোমার মুখদর্শন করতে চাই না।

রঘুনাথ নীরবে নতমস্তকে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

চন্দ্ররাও জুমলাদার সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলা দরকার। তিনি শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ গজপতি সিংহের কাছে মানুষ হয়েছিলেন। একবার এক যুদ্ধের সময় অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে চন্দ্ররাও গজপতির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাতে মহা সন্তুষ্ট হয়ে গজপতি চন্দ্ররাওকে বলেন, তুমি কি চাও বল। যা চাও তাই তোমাকে দেব।

উত্তরে চন্দ্ররাও বলেন, মহারাজ, আমি আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করতে চাই।

তাঁর কথা শুনে গজপতি বিষম ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং চন্দ্ররাওকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে চন্দ্ররাও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সেই সুযোগ এলো।

এক বছরের মধ্যেই গজপতি এক যুদ্ধে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে রঘুনাথের বয়স তখন তেরো, মেয়ে লক্ষ্মীর বয়স নয়।

বাবাকে হারিয়ে ভাইবোন দুজনে এক ভৃত্যের সঙ্গে মাড়াবার থেকে মেবারের দুর্গে যাবার জন্যে বেরুলো। তাদের মা আগেই গত হয়েছিলেন।

পথে একদল দস্যু ভৃত্যটিকে মেরে ফেলে রঘুনাথ আর লক্ষ্মীকে মহারাষ্ট্র দেশে নিয়ে গেল। রঘুনাথ ছেলেমানুষ হলেও অসমসাহসী ছিলেন। তিনি রাতের বেলায় দস্যুদের শিবির থেকে পালিয়ে গেলেন। মেয়েটিকে দস্যু দলপতি জোর করে বিবাহ করলেন। চন্দ্ররাও ই সেই দস্যুদলপতি।

বিবাহের পর চন্দ্ররাও জায়গীর কিনলেন এবং ক্রমে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক বলে গণ্য হলেন। তাঁর সাহস ও বিক্রমের কথা জেনে শিবাজী তাঁকে জুমলাদারের পদে নিযুক্ত করলেন।

তার অল্পদিন পরেই রঘুনাথ শিবাজীর সৈন্যদলে ভর্তি হলেন এবং চন্দ্ররাওর নজরে পড়লেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে সহ্য করতে পারলেন না, কৌশল করে তাঁর পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিলেন।

রঘুনাথ সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে চন্দ্ররাওকে দেখে তাঁর বাবার পুরাতন ভৃত্যরূপে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু জানতে পারেননি এই লোকই তাঁকে আর তাঁর ভগ্নীকে অপহরণ করেছিল এবং এই লোকই তাঁর ভগ্নীপতি।

॥ ছয় ॥

চন্দ্ররাওর বাড়ি থেকে কিছু দূরে ছিল ঈশানী মন্দির। রুদ্রমণ্ডল দুর্গ থেকে বেরিয়ে রঘুনাথ সেখানে গিয়ে হতাশ মনে বসেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ভগ্নী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোয়ে গেল। লক্ষ্মী সেই সময় পূজা দিতে এসেছিলেন।

ভাই-বোনে মিলে অনেক চোখের জল ফেললেন। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল দু'জনের মধ্যে। রঘুনাথের সমস্ত কথাই লক্ষ্মী শুনলেন। নিজের কথা বললেন, শুধু স্বামীর নাম বললেন না, জানালেন তিনি একজন মারাঠা জায়গীরদার।

কথায় কথায় লক্ষ্মী বললেন, দাদা, শিবাজী তোমাকে যে সন্দেহ করেছেন তা তুমি নিজের কাজ দেখিয়ে খণ্ডন কর। শুনলাম, শিবাজী দিল্লী যাচ্ছেন। সেখানে কত কি ঘটতে পারে। তুমিও সেখানে যাও। দরকার হলে শিবাজীর কাজে লেগে তোমার আসল পরিচয় দাও।

লক্ষ্মীর কথায় রঘুনাথ উৎসাহিত বোধ করে বললেন, ভাল কথা বলেছিস বোন। আমি তাই করব।

লক্ষ্মী বললেন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে দাদা।

কি অনুরোধ?

লক্ষ্মী বললেন, চন্দ্ররাও নামে এক জুমলাদার বোধ হয় তোমার খুব ক্ষতি করেছেন, তাই না?

রঘুনাথ বললেন, খুবই ক্ষতি করেছে। অবশ্য সে শিবাজী মহারাজের কাছে যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়।

লক্ষ্মী বললেন, সে যাই হোক, তুমি শপথ কর, তুমি তাঁর কোন অনিষ্ট করবে না।

মনে মনে বিস্মিত হয়ে রঘুনাথ শপথ করলেন।

রঘুনাথ যে বললেন, চন্দ্ররাও তাঁর নামে মিথ্যা বলেনি, তার মানে হল এই যে সত্যিই রুদ্রমণ্ডল দুর্গ অভিযানের যাত্রাকালে রঘুনাথ নিজেদের শিবিরে ছিলেন না। তিনি সেই সময় জনার্দনদেবের বাড়ি গিয়েছিলেন সরযূর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে রঘুনাথ শিবাজীকে বলতে পারেন নি। আর চন্দ্ররাও-ও সে কথা জানতেন না। তিনি রঘুনাথের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েছিলেন মাত্র।

॥ সাত ॥

রাজা জয়সিংহের অনুরোধে এবং সম্রাট আওরংজেবের আমন্ত্রণে শিবাজী দিল্লী গেলেন। সঙ্গে পাঁচশো অশ্বারোহী, এক হাজার পদাতিক এবং পুত্র শম্ভুজী, মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত ও সুহৃদ তন্নজী মালশ্রী।

কিন্তু দরবারে হাজির হয়ে শিবাজী দেখলেন, তাঁকে অভ্যর্থনার মধ্যে আন্তরিকতা নেই, বরং যেন অবজ্ঞা পরিস্ফুট। সম্রাট তাঁকে কোনরকম সম্মান বা সমাদর দেখালেন না। শিবাজী রাগে ফুলতে লাগলেন।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, তাঁকে দিল্লীতে আটকে রাখাই আওরংজেবের আসল মতলব। তিনি বিচলিত মনে দিল্লী থেকে চলে যাবার উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

সেইদিন রাত্রেই এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী শিবাজীর কাছে এলেন। শিবাজী তাঁকে চিনতে পারলেন। তাঁর নাম সীতাপতি গোস্বামী। মাত্র কয়েকদিন আগে এই নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিবাজীর পরিচয় হয়।

সীতাপতি বললেন, মহারাজ, দিল্লী থেকে আপনার পালাবার সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। আপনি আমার দেওয়া ছদ্মবেশ পরে এখনি অনায়াসে এখান থেকে চলে যেতে পারেন। কেউ কোন সন্দেহ করবে না। পাঁচীলের ওধারে নদীতে এক আট মাল্লাই নৌকো ঠিক করা আছে। তাতে করে আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই মথুরায় পৌঁছোতে পারবেন। সেখানে আপনার ভগ্নীপতি সমস্ত ঠিক করে রেখেছেন।

শিবাজী বললেন, সীতাপতি, আপনার চেষ্টা আর আয়োজনের জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিন্তু আমার আশ্রিত সঙ্গীদের বিপদের মধ্যে ফেলে আমি পালাতে চাই না। আমি একটা উপায় নিশ্চয় বার করতে পারবো।

সীতাপতি বললেন, মহারাজ, আজ যদি না যান, কাল আর সে সুযোগ পাবেন না। কাল থেকে আপনি বন্দী, আমি পাকা খবর জেনে এসেছি।

শিবাজী তবুও যেতে রাজী হলেন না। সীতাপতি চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই শিবাজী দেখলেন, সীতাপতির কথা মিথ্যা নয়। তাঁর বাড়ীর চারপাশে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন হয়েছে। তিনি সত্যিই বন্দী। রুদ্ধরোষে শিবাজী মনে মনে বললেন,—মুঘল সম্রাট, এই শঠতার উত্তর তুমি পাবে।

সেইদিনই তিনি রঘুনাথ পন্তকে দিয়ে এক আবেদন-পত্র লিখিয়ে আওরংজেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই পত্রে শিবাজী নিজের অনুচর ও সৈন্যদের স্বদেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে সম্রাটকে আবেদন জানালেন। আওরংজেব খুসী হয়ে যথাযথ আদেশ দিলেন। সকলেই চলে গেল। রইলেন কেবল শিবাজী আর তাঁর ছেলে শম্ভুজী।

তারপর দু'চার দিনের মধ্যেই দিল্লী শহরে রটে গেল যে শিবাজী গুরুতর অসুস্থ। অবস্থা সংকটজনক। তাঁর ঘরের দরজা জানলা সব সময়েই বন্ধ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৈদ্য হাকিম প্রভৃতিরা তাঁকে দেখতে আসছেন। তারই মধ্যে একদিন তন্নজী মালশ্রী মুসলমান হাকিমের ছদ্মবেশে শিবাজীর সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তিনি জানিয়ে গেলেন, লোক লস্কর ঘোড়া নৌকা সমস্তই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এখন শিবাজী যে কোন সময়ে পালাতে পারেন।

দু'দিন পরেই সংবাদ প্রচারিত হল যে শিবাজী সেরে উঠেছেন এবং মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠাচ্ছেন। প্রত্যহ তিনি রাশি রাশি মিষ্টান্ন কিনতে লাগলেন এবং বড় বড় ঝুড়িতে ভর্তি করে সেগুলি আমির, ওমরাহ, রাজা মহারাজা প্রভৃতি বড় বড় লোকদের বাড়ি পাঠাতে লাগলেন। এমন কি প্রতি মসজিদে এবং ফকিরদের সেবার জন্যে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠানো হোতে লাগল। সে এক এলাহি ব্যাপার।

একদিন সন্ধ্যার সময় দুটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের ঝুড়ি শিবাজীর বাড়ি থেকে বেরুলো। প্রহরী জিজ্ঞাসা করল, এত বড় দুটো ঝুড়ি কার বাড়ি যাচ্ছে। উত্তর শোনা গেল, রাজা জয়সিংহের বাড়ি।

প্রহরীরা অজকাল আর ঝুড়ি পরীক্ষা করে দেখে না। শত শত ঝুড়ি পরীক্ষা করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

বাহকদের মাথায় ঝুড়ি দুটি চলে গেল। কিছুদূর গিয়ে এক অন্ধকার গোপন স্থানে তারা ঝুড়ি দুটি নামালো, তাদের ভিতর থেকে বেরুলেন, শিবাজী আর শম্ভুজী।

অদূরে গাছের নীচে একটা তেজী ঘোড়া। শিবাজী অশ্বরক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বন্ধু?

উত্তর শোনা গেল, আমার নাম জানকীনাথ। মথুরায় যাব।

শিবাজী বুঝলেন, এ ঘোড়া তাঁরই জন্যে। ছেলেকে নিয়ে তিনি

ঘোড়ায় উঠলেন। অশ্বরক্ষক পিছনে পিছনে যেতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই দারুণ বিপদ। তিনজন মোগল সেনা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের নিমেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে বুঝি আর পিতা-পুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় না।

এমন সময় একটি তীর এসে সামনের মোগল সৈন্যের বুকে বিঁধল। পরে আর একটা তীর আর একজনকে বিদ্ধ করল। তারপর তৃতীয় তীরের ঘায়ে অন্যজনও ভূতলশায়ী হল এবং মারা পড়ল।

শিবাজী দেখলেন, তীরন্দাজ আর কেউ নয়, অশ্বরক্ষক জানকীনাথ। সে কাছে এলে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, অশ্বরক্ষক তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সীতাপতি গোস্বামী।

শিবাজী আবেগভরে সীতাপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

তখন সীতাপতি তাঁর মাথার পাগড়ী আর নকল গোঁফ খুলে ফেলে শিবাজীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, মহারাজ এই ছদ্মবেশের জন্যে ক্ষমা করুন। আমি আপনার পুরনো সেবক রঘুনাথজী হাবিলদার। আমি আর কিছু চাই না। শুধু আজীবন আপনার সেবা করব, এই প্রার্থনা।

শিবাজী কিছুক্ষণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলেন। তারপর রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, রঘুনাথ, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমার প্রতি অবিচার করেছি। আমায় ক্ষমা কর ভাই।

॥ আট ॥

শিবাজীর প্রত্যাবর্তনের পর সারা মহারাষ্ট্রে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হল। বহু শতাব্দী পরে ভারতে আবার হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হবে—নগরে নগরে এই বার্তা ছুটতে লাগল।

এই সময় রাজা জয়সিংহ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে শিবাজী অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হলেন।

পরদিন প্রত্যূষে সুবিস্তীর্ণ মাঠে শিবাজীর নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা সমবেত হল। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি এক আবেগময় মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বললেন, বন্ধুগণ, প্রায় এক বছর হল আমরা আওরংজেবের সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। কিন্তু তাঁর কপট আচরণে সে সন্ধি নাকচ হয়ে গেছে। আমরা মোগলদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ শুরু করব। তোমরা প্রস্তুত হও। বন্ধুগণ, আমি দেখতে পাচ্ছি, মোগলদের সৌভাগ্য-সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। মারাঠাদের ভাগ্য-তারকা মধ্যগগণে সমুজ্জ্বল। বন্ধুগণ, অগ্রসর হও, দিল্লীর সিংহাসন আমরা অধিকার করব। পূর্বগগণে যে লাল ছটা দেখছো, তা নতুন প্রভাতের দীপ্তি। এ প্রভাত আমাদের জীবন-প্রভাত, মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত।

সৈন্যরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল—আজ আমাদের জীবন-প্রভাত।

॥ নয় ॥

রঘুনাথজীর প্রতি বিদ্বেষে মনে মনে জ্বলছিলেন চন্দ্ররাও।

একদিন সন্ধ্যায় নদীর তীরে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, এ সংসারে তোমার আমার দু'জনের জায়গা নেই। আমাদের একজনকে মরতে হবে। জন্মাবধি তুমি আমার শত্রু। আজ সেই শত্রুকে শেষ করব। না হয় নিজে মরব।

রঘুনাথ লক্ষ্মীর কাছে যে শপথ করেছিলেন, তা তাঁর মনে পড়ল। বললেন, তুমি পাপিষ্ঠ! কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি লড়ব না।

চন্দ্ররাও বললেন, ভীরু, কাপুরুষ! হবে না? কেমন বাপের বেটা। শোন্ বেকুব! তোর বাপকে আমিই মেরেছি।

এই কথার পর রঘুনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তলোয়ার নিয়ে চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হতে

লাগল। শেষ পর্যন্ত চন্দ্ররাও মাটিতে পড়ে গেলেন। রঘুনাথ বললেন, আজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।

চন্দ্ররাও বললেন, আর সেই সঙ্গে বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিবি।

বিস্মিত হয়ে রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে ছেড়ে দিলেন। লক্ষ্মীর কথা তাঁর মনে পড়ল। সে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল, রঘুনাথ যেন চন্দ্ররাওর কোন ক্ষতি না করে।

এমন সময় সহসা গাছের আড়াল থেকে একজন যোদ্ধা সামনে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, স্বয়ং মহারাজ শিবাজী তাঁদের সামনে। শিবাজী কোন কথা বললেন না। শুধু পিছনে যে চারজন সৈন্য এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের আদেশ করলেন, চন্দ্ররাও জুমলাদারকে বন্দী কর।

পরদিন সকালে চন্দ্ররাওর বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হত্যা করেছেন অথবা কাল রঘুনাথকে বধ করবার চেষ্টা করেছিলেন— বিচার সেজন্যে নয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে, রুদ্র মণ্ডল দুর্গ আক্রমণের আগে, চন্দ্ররাওই সেই গুপ্ত সংবাদ শত্রুদের জানিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে চন্দ্ররাও-এর বিচার।

বিচারে চন্দ্ররাও-এর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হল।

রঘুনাথ চন্দ্ররাওর মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু শিবাজী অটল। তখন একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় অমাত্য তাঁকে জানালেন যে চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগ্নীপতি। শুনে বিস্মিত হয়ে শিবাজী চন্দ্ররাওকে মুক্তি দেবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু চন্দ্ররাও সকলকে আরো বিস্মিত করে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরিকা বার করে আত্মহত্যা করেলেন।

শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পতিব্রতা লক্ষ্মীবাঈ সহমৃতা হলেন।

কিছুদিন শোক এবং বিষাদের মধ্যে কাটল। তারপর রঘুনাথের সঙ্গে সরযুর বিবাহ সম্পন্ন হল এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন পরম আনন্দের মধ্যে কাটতে লাগল।

শ্রীমন্ত উপাখ্যান

[পশ্চিম বাংলায় চিরকালই চণ্ডীর বড় প্রতাপ। তাঁর মাহাত্ম্য প্রচার করে বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামের অধিবাসী কবিকংকন মুকুন্দরাম রচনা করেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এই কাব্য রচিত হয়েছে বলে অনুমিত। চণ্ডীমঙ্গল ভাবে, ভাষায়, সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনায় বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে স্বীকৃত। এর মধ্যে তিনটি উপাখ্যান আছে। তা থেকে তৃতীয় উপাখ্যানের সংক্ষেপিত কাহিনী এখানে পরিবেশিত হল।]

॥ এক ॥

শ্রীমন্ত বড় দুষ্ট ছেলে। পাড়ার ছেলেরা এসে তার মা খুল্লনার কাছে নালিশ করে—শ্রীমন্ত তাদের মারধর করে, লাঞ্ছিত করে।

মা খুল্লনা দেখলেন, আর দেরী করা উচিত নয়। ছেলের লেখাপড়া শুরু হওয়া দরকার। তিনি গাঁয়ের পণ্ডিত জনার্দন ওঝাকে ডাকিয়ে তার হাতে ছেলের শিক্ষার ভার অর্পণ করলেন।

দেখতে দেখতে শ্রীমন্ত বিস্তর বই পড়ে শেষ করল। অসাধারণ চেষ্টা আর স্মরণশক্তি, আর তেমনি তার্কিক। কোন কথা বিনা তর্কে মেনে নেবে না। পণ্ডিতমশায় বারে বারে বিব্রত হয়ে পড়েন তার কাছে।

শ্রীমন্ত আর তার মার জীবনে একটা মহা দুঃখ। শ্রীমন্তর বাবা ধনপতি সদাগর বহুদিন ঘরছাড়া। তিনি সিংহলে গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে। শোনা যায়, সিংহলের রাজা সন্দেহবশত তাঁকে শত্রু মনে করে কারারুদ্ধ করে রেখেছে।

পণ্ডিত একদিন তর্কে পরাস্ত হয়ে শ্রীমন্তকে অপমান করে বললেন, 'যা যা, তুই আর কথা বলিস না, তোর বাপ তো বিদেশে গিয়ে মরেছে, অথচ তোর মা হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী ঘেন্নার কথা। যার বাপের খোঁজ নেই, তার আবার এত লম্বা লম্বা কথা।

এই নিষ্ঠুর কথা শুনে শ্রীমন্ত প্রথমে কেঁদে আকুল হল। তারপর প্রতিজ্ঞা করলে, সে তার বাপকে ফিরিয়ে আনবে। যদি না আনতে পারে তাহলে সে আর প্রাণ রাখবে না।

॥ দুই ॥

শ্রীমন্তের শপথ শুনে মা খুল্লনা তো ভয়ে কাঁটা। বললেন, 'কোথায় কেমন করে তাঁর খোঁজ করবে বাছা।'

শ্রীমন্ত বললে, 'আমাদের রাজা বাবাকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে। কিন্তু তিনি আজো ফিরলেন না। তাই আমি তাঁর খোঁজে সিংহলে যাব। ঘরে যা টাকাকড়ি আছে দাও। আমি ডিঙা সাজিয়ে রওনা হব।'

খুল্লনা সভয়ে বললেন, 'না বাবা, অমন দেশে গিয়ে কাজ নেই। সাগর-পথে কত তিমিংগিলে হাঁ করে আছে। কাছে নৌকা গেলেই গিলে ফেলে। তাছাড়া সেখানকার নোনা হাওয়ায় প্রাণ বাঁচানো দায়।

শুনেছি সিংহল বড় দুরন্ত দেশ। সেখানকার রাজা বড় দুর্জন। অকারণে লোককে ধনে-প্রাণে মারে। সে দেশের ছারপোকাও নাকি এক একটা কচ্ছপের মত। মশা নাকি বোলতার মত। না, না বাছা, অমন দেশে গিয়ে কাজ নেই। তোর বাবা শিগ্‌গিরই ফিরে আসবেন।'

কিন্তু শ্রীমন্ত তার জেদ ছাড়ল না। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে গুম হয়ে বসে রইল। তখন মা খুল্লনা অগত্যা ছেলেকে সিংহল যাত্রার অনুমতি দিলেন।

গণকঠাকুর এসে দিনক্ষণ ঠিক করলেন।

শ্রীমন্ত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজার অনুমতি নিতে গেল। রাজা না অনুমতি দিলে কেউ রাজ্য ছেড়ে বাণিজ্য যাত্রায় যেতে পারবে না।

রাজাকে ভেট দেবার জন্য শ্রীমন্ত সঙ্গে নিল দু'ভাঁড় দই, দু'পণ মর্তমান কলা, দশ ঘড়া ঘি, দশ কাঁদি নারিকেল, এক হাঁড়ি নাড়ু, দু'খানা রেশমী কাপড়, দু'জোড়া পুষ্টকান্তি ভেড়া, দুটো তেজী ঘোড়া।

ভেটের বহর দেখে রাজা রঙ্গ করে বললেন, 'কী হে দত্তের পো, এত ভেট কেন? তোমার বিয়ে নাকি?'

শ্রীমন্ত বললে, 'আপনার আশীর্বাদে বাবা যদি ফিরে আসেন, তার চেয়ে কী বিয়ের আনন্দ বড়! আমি বাবাকে আনতে যাব। অনুমতি চাই।'

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখে রাজা খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন।

রাজ্যের সেরা কারিগর সপ্তডিঙা তৈরি করল। এক ডিঙা কুড়ি হাত। মকর মাথা, মাথায় মাণিকের চোখ।

'সিংহমুখী', 'রণজয়ী', 'রসভীমা', 'মালতী', 'স্বর্ণমালা', 'হিল্লোলা' ও 'চন্দ্রকলা'—কী সুন্দর সব নাম!

খুল্লনা চণ্ডী ভক্ত। দেবীর পূজা দিলেন ষোড়শোপচারে। ছেলেকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'দুর্গম পথে 'দুর্গা' নাম ভুলো না। সাবধানে থেকো। আশীর্বাদ করি, বাপে-বেটায় মিলে ঘরে ফিরে এস।'

॥ তিন ॥

ভ্রমরার জলে চলেছে সপ্তডিঙা।

পথের দু'ধারে কত গ্রাম, কত নগর, কত বিচিত্র মানুষ, ঘরবাড়ি, বেশ-বাস। একে একে কত জনপদ পার হল। উজানী, হুসেনপুর, নৈহাটি, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, হালিসহর, হিজলী।

মগরায় পৌঁছে সপ্তডিঙা হঠাৎ ঝড়ের মুখে পড়ল। সেই সঙ্গে বৃষ্টি।

আকাশ থেকে গুলির মত এক একটা শিল পড়ে মাথার খুলি যেন ফুটো হয়ে যাচ্ছে। মাঝিরা জলের তোড়ে দাঁড় সামলাতে পারছে না। চারিদিকের কালো জলে শুধু সাদা ফেনার অট্টহাসি। নৌকার পাশে পাশে হাঙরের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সপ্তডিঙা ডুবু ডুবু।

শ্রীমন্ত 'মা', 'মা' বলে অনেক প্রার্থনা করল। কিন্তু জলঝড় আর থামে না।

তখন সে চণ্ডীর নাম স্মরণ করে জলে ঝাপ দিল। যদি কোন রকমে তীরে পৌঁছানো যায়।

অমনি গাঙের জল হয়ে গেল এক হাঁটু। মহামায়া চণ্ডী আকাশ থেকে খলখল করে হাসতে লাগলেন। সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কেটে গেল। রোদ উঠল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল।

শ্রীমন্ত মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আবার ডিঙা ভাসিয়ে দিল।

সপ্তডিঙা পৌঁছালো শ্রীক্ষেত্রধামে। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দেখে মুগ্ধ হল শ্রীমন্ত। তারপর আবার যাত্রা। চিলকা, কালিঘাটা, চিংড়িদহ, কাঁকড়াদহ, সংঘদহ, হাঁড়িয়াদহ পার হয়ে সপ্তডিঙা সেতুবন্ধে এসে থামল। সামনেই কালীদহ। কালীদহ পার হলেই সিংহল।

কিন্তু ইতিমধ্যে চণ্ডী ঠাকরুণ পদ্মার সঙ্গে যুক্তি করে কালীদহে মায়া পেতে রেখেছেন।

শ্রীমন্ত দেখল কালীদহের মাঝখানে বিরাট পদ্মবনে হাজার হাজার পদ্মফুল, আর তার গন্ধে আকাশ-বাতাস আমোদিত। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং কী আশ্চর্য! সেই পদ্মবনের মাঝখানটিতে পদ্মের উপর বসে আছে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে।

যেন কমলেকামিনী।

মাঝি-মাল্লাদের দেখে তার ভয় নেই। সেই আশ্চর্য মেয়ে ডান হাত দিয়ে হাতী গিলে উগরে দিচ্ছে, হাতী পালাতে গেলে বাঁ হাত দিয়ে ধরে গিলে ফেলে। অথচ মেয়েটির চোয়াল নড়ছে না। সে হেসে হেসে চারিদিকে তাকাচ্ছে, আবার কখনো বা দু'হাত তুলে নাচছে। তার অপরূপ রূপের ছটায় চারিদিকে ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছে।

॥ চার ॥

শ্রীমন্তের সপ্তডিঙা সিংহলের কূলে ভিড়ল। পারে যেতে শ্রীমন্ত তাঁবু ফেলল। তারপর তার বাদকরা দামামায় ঘা দিল।

সিংহলরাজ শালিবাহন হঠাৎ দামামার বাজনা শুনে কোটালকে ডেকে বললেন, "কোটাল, কে এলো? রত্নমালার ঘাটে বাজায় কে? 'ঘরদল' অর্থাৎ মিত্র হলে রাজপুরীতে নিয়ে এসো। 'পরদল' অর্থাৎ শত্রুপক্ষের লোক হলে মেরে তাড়িয়ে দেবে, না হয় সোজা কারাগারে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখবে।"

ছুটতে ছুটতে কোটাল রত্নমালার ঘাটে হাজির হল।

শ্রীমন্ত বললে. "আমি শত্রু নই। বিদেশী বণিক। আদর পেলে থাকব। নইলে আবার নাও ভাসিয়ে চলে যাব। 'ঘরদল'-'পরদল' বুঝি সুঝি না।"

শ্রীমন্তকে কোটাল সসম্মানে রাজার কাছে নিয়ে এলো।

শ্রীমন্ত নিজের পরিচয় দিল, "অজয়ের তটে ঘর, জাতিতে গন্ধ বণিক, দত্তকূলে জন্ম।"

রাজা খুশী হয়ে বাণিজ্য বিনিময় করলেন। শ্রীমন্ত পেল কুরংগের বদলে তুরংগ, কাচের বদলে নীলা, পাটের বদলে চামর, ভেড়ার বদলে ঘোড়া. চইএর বদলে চন্দন, পায়রার বদলে শুক, আরও কত কি!

সভামধ্যে রাজার কাছে শ্রীমন্ত 'কমলেকামিনী'র কথা বলল। আরও বলল সে প্রত্যক্ষ দেখাতেও পারে। যদি না পারে তো তার ধনরত্ন যেন লুটে নেওয়া হয়, আর তাকে যেন মশানে বলি দেওয়া হয়।

রাজাও প্রতিজ্ঞা করলেন, "যদি দেখাতে পারো তা রাজকন্যা আর সমস্ত রাজত্ব তোমায় দেব।"

দলবলসহ রাজা কালীদহে গেলেন।

কিন্তু কোথায় বা কমলবন আর কোথায় বা কমলেকামিনী। চারিদিকে শুধু কালো জল ঝলমল করছে।

শ্রীমন্ত বললে, আমার কথা মিথ্যে নয়। বোধহয় রাজার এত সব পাইক পেয়াদা দেখে সুন্দরী ভয়ে লুকিয়েছে।

কিন্তু অনেক অপেক্ষা করে, পাইক পেয়াদাদের সরিয়ে দিয়েও যখন কমলেকামিনীর দেখা পাওয়া গেল না তখন ক্রুদ্ধ রাজা শ্রীমন্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। আদেশ দিলেন তাকে দক্ষিণ মশানে বলি দেওয়া হবে।

শ্রীমন্ত কোটালকে টাকা দিয়ে বশ করে কিছু সময় নিল, তারপর স্নান করে পবিত্র হয়ে মা চণ্ডীকে ডাকতে লাগল। মা কত আশা করে তোমার নাম নিয়ে এই দূর-বিদেশে এসেছি বাবার খোঁজে। আজ আমি ধনে প্রাণে গেলাম। কিন্তু বাবার দেখা পেলাম না। তোমার অসাধ্য কিছু নেই মা। তাই আমি তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দিলাম।

॥ পাঁচ ॥

শ্রীমন্তের কাতর প্রার্থনায় চণ্ডীর মন টলল। তিনি বুড়ীর বেশ ধারণ করে মশানে উপস্থিত হয়ে জহ্লাদকে বললেন, "শ্রীমন্তকে ছেড়ে দাও। ছেলে মানুষের অপরাধ নিতে নেই।"

জহ্লাদ তো তাঁকে তেড়ে মারতে এলো। সময় হয়ে গিয়েছে। এবার শ্রীমন্তকে বলি দেওয়া হবে।

কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে বনঝাঁটা নামে সাত ভাই চণ্ডীর চেলা হয়ে ধেয়ে এলো। তখন জহ্লাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলে। অন্য প্রহরীরাও তাদের হাতে মারা পড়ল।

খবর শুনে কোতোয়াল আরও সৈন্য পাঠাল। রণ দামামা বেজে উঠল। রাজার সৈন্য সামন্ত পাইক পেয়াদায় মশান ভরে গেল। কিন্তু চণ্ডীর চেলা দানোদের সঙ্গে পারবে কে? রাজার সেনারা মরে মরে শেষ হয়ে গেল।

তখন রাজা শালিবাহন স্বয়ং পাত্রমিত্র নিয়ে মশানে এলেন। ব্যাপার দেখে তার তো চক্ষু স্থির। তিনি তখন হাত জোর করে বুড়ীর কাছে সন্ধি প্রার্থনা করলেন।

দেবী কৃপা করে শালিবাহনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন আর বললেন, রাজকন্যা সুশীলাকে শ্রীমন্তের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু শ্রীমন্ত তখন বাবার জন্য বড় উতলা। বিয়েতে তার মন নেই। সে পাগলের মতো চারিদিকে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন।

॥ ছয় ॥

কোথায় ধনপতি সদাগর ?

কারাগার থেকে বন্দীদের একে একে এনে শ্রীমন্তর সামনে হাজির করা হল।

কিছুক্ষণ পরে এক লম্বা দাড়ি জটাজুটধারী বন্দীকে দেখে শ্রীমন্তর মনে হল এই তার বাবা। তার মা ধনপতির যেমন যেমন চেহারার লক্ষণ বলে দিয়েছিলেন, তেমন তেমন সব লক্ষণই তো মিলে যাচ্ছে।

বন্দী শ্রীমন্তের কাছে মিনতি করে বললে—'একখানি কাপড় ভিক্ষে দাও বাবা। মুক্তি দাও আমায়, কারাগারে বড় কষ্টে আছি!'

ক্রমে পরিচয় আদান-প্রদান হল। বাপের অবস্থা দেখে ছেলে তো কেঁদে আকুল, ছেলেকে দেখে বাপও কেঁদে সারা।

ধনপতি ছেলেকে এই নিষ্ঠুর দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে বারণ করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর কথায় রাজী হলেন এবং শুভলগ্নে রাজকন্যা সুশীলার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে হয়ে গেল।

সিংহলের রাজপ্রাসাদে সুখে আছে শ্রীমন্ত।

একদিন রাত্রে সে স্বপ্ন দেখল, তার মা তার শিয়রে বসে কেঁদে বলছেন—'বাবা শ্রীমন্ত, আমাকে তুমি কেমন করে ভুলে গেলে! তোমাকে কোল থেকে ছেড়ে দূরদেশে পাঠিয়েছিলাম বড় সুখের আশায়। আর আমি আজ দরিদ্র অবস্থায় ধান ভেঙে খাই, হাটে সুতো বেচি। পরণে কাপড় নেই, মাথায় তেল নেই। স্বামীপুত্র হারিয়ে এ আমার কী দশা! কোন্ সুখে বেঁচে থাকব ?'

শ্রীমন্ত ঘুম থেকে উঠে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগল। সে

এখনি মায়ের কাছে যাবে। সিংহলে রাজসুখ তার গায়ে যেন কাটার মতো বিঁধছে।

পিতা-পুত্র শালিবাহন রাজার কাছে বিদায় চাইল। সব শুনে রাজা খুশীমনেই সম্মতি দিলেন।

সিংহলের রাজপুরী কাঁদিয়ে বধূ সুশীলা, মায়ের আদরের 'শীলা', স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে চলল সুদূর বাংলা দেশে শ্বশুর বাড়ীতে।

ধনে-জনে পূর্ণ হয়ে শ্রীমন্ত ফিরে এলো উজানীতে—মায়ের কোলে।

সাতদিন ধরে উজানীতে উৎসব চলল।

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

[কলকাতার বিখ্যাত রামবাগান দত্ত-বংশের সন্তান (পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত) রমেশচন্দ্র (১৮৪৮-১৯০৯) বিলাত থেকে আই. সি. এস. হয়ে এসে রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে রেভাঃ লালবিহারী দে পরিচালিত 'Bengal Magazine'-এ ইংরাজীতে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা পড়ে একদিন তাঁকে বলেন—তুমি আমার বঙ্গদর্শনের জন্যে লেখো।

উত্তরে রমেশচন্দ্র বলেন—আমি তো বাংলা লিখতে জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র সহাস্যে বলেন—তোমার মতো কৃতবিদ্য মনীষী যা লিখবে তাই বাংলা হবে। তুমি লেখো।

বঙ্কিমের কাছে উৎসাহ পেয়ে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমেরই প্রদর্শিত পথে বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন এবং ছ'খানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করেন (চারখানি ঐতিহাসিক, দু'খানি সামাজিক)। যথা · বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ। এগুলির মধ্যে জীবন-প্রভাত ও জীবন-সন্ধ্যা বই দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী হলেও রমেশচন্দ্রের রচনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল না। লেখার ভঙ্গী যেমন দৃঢ়সংবদ্ধ, চরিত্র চিত্রণও তেমনি বাস্তবানুগ। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি রূপে পরিগণিত।]

॥ **এক** ॥

১৫৪৬ খৃষ্টাব্দ। সেই বছর ফাল্গুন মাসের প্রথম দিনে মেওয়ার প্রদেশের অন্তর্গত সূর্যমহল নামে পার্বত্য দুর্গে মহা কোলাহল শোনা গেল। বহু অশ্বারোহী বর্শা নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

আজ আহেরিয়া, অর্থাৎ বসন্তের আরম্ভে সাম্বৎসরিক মৃগয়ার উৎসব। আজকের মৃগয়ার ফলাফলের দ্বারা সারা বছরের যুদ্ধের

কলাফল বোঝা যাবে। তাই আজ সূর্যমহলের দুর্গাধিপতি শত অশ্বারোহী নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। দুর্গেশ্বর দুর্জয় সিংহ ছিলেন এক দুর্দমনীয় যোদ্ধা।

শিকারীরা অনেকক্ষণ বনে বনে ঘুরলেন। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। কিন্তু কোথাও কোন বনচর পশুর দেখা পাওয়া গেল না। তখন শিকারীরা এক নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বিশ্রাম করতে বসলেন। দুর্জয় সিংহ বললেন, আট বছর আগে যখন আকবর চিতোর হস্তগত করেন, রাণা উদয় সিংহ দুর্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ চন্দ্রাওয়াৎ কুলপতি সাহীদাস দুর্গ ত্যাগ করেননি। চারণদেব! সেদিনকার কথা একবার যোদ্ধাদের শোনাও।

আহোরিয়ার দিন চারণদেব যোদ্ধাদের সঙ্গেই থাকেন। তিনি উদাত্তকণ্ঠে সাহীদাসের গৌরব-গাথা, দুর্জয় সিংহের বীরত্ব-গাথা গাইলেন। শুনতে শুনতে চন্দ্রাওয়ৎ যোদ্ধাদের চক্ষু দিয়ে অগ্নিকণা বার হতে লাগল। দুর্জয় সিংহ বলে উঠলেন, বীরগণ! আজ আমাদের চারিদিকে বিপদ, কিন্তু চন্দ্রাওয়ৎ বংশ বিপদকে ডরায় না। বলুন, মহারাণা প্রতাপ সিংহের জয়। শিশোদিয়ৎ বংশের জয়। চন্দ্রাওয়ৎ কুলের জয়।

প্রবল জয় ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হল। যোদ্ধারা ঘোড়ায় চড়ে আবার শিকারের সন্ধানে ছুটলেন। এবার তারা একটা ঝোপের ভিতর প্রকাণ্ড এক বরাহ দেখলেন। বরাহের অনুসরণ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। শিকারীরা শ্রেণীভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক হয়ে গেলেন। দুর্জয় সিংহ একাকী সেই বরাহের পিছনে পিছনে সেই বনের মধ্যে বহুদূর গিয়ে পড়লেন বরাহটা তখন হঠাৎ থেমে পিছন ফিরে বিদ্যুৎবেগে দুর্জয় সিংহকে আক্রমণ করল।

দুর্জয় সিংহ বর্শা ছুঁড়লেন। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বরাহ চোখের পলকে ঘোড়ার পেট চিরে ফেলল। দুর্জয় সিংহ ঘোড়া থেকে

লাফ দিয়ে কিছু দূরে গিয়ে পড়লেন। বরাহ তখন মৃত ঘোড়াটাকে ছেড়ে তাঁর দিকে ধাবমান হল। মৃত্যু অনিবার্য।

হঠাৎ একটা বর্শা এসে বরাহের মুখে লাগল। বরাহের দাঁত ভেঙে রক্ত পড়তে লাগল। আহত হয়ে হিংস্র পশু জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

আধো-অন্ধকারে দুর্জয় সিংহ দেখলেন, পাহাড় থেকে এক দীর্ঘ-কান্তি পুরুষ নেমে আসছেন।

॥ দুই ॥

আহেরিয়ার দিন বরাহ পালিয়ে গেল, বর্শা ব্যর্থ হল, অন্যের সাহায্যে জীবন রক্ষা পেল, এইসব চিন্তায় অভিভূত দুর্জয় সিংহ তাঁর প্রাণরক্ষাকারীকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়ে কতকটা রুক্ষ ভাবে বললেন, "আমি আপনাকে চিনি না। বোধহয় আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন। আপনার নাম জানতে পারি?"

অপরিচিত যুবক স্থিরকণ্ঠে জবাব দিলেন, মেওয়ারের এই বিপদের সময় দুর্জয় সিংহের মত বীরের প্রাণরক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্তব্য। আমার নাম পরে জানবেন। এখন আপনি শ্রান্ত। কুটিরে এসে বিশ্রাম করুন।

অন্ধকার বনপথ দিয়ে দু'জনে নীরবে চলতে লাগলেন। অপরিচিত যুবকের মত বিশাল বক্ষ, সুগঠিত বলিষ্ঠ বাহু, উন্নতকায় পুরুষ দুর্জয় সিংহ আর দেখেননি। অথবা আট বছর আগে কেবল একজনকে দেখেছিলেন।

কিছুদূর গিয়ে যুবক বললেন, আমার একটি অনুরোধ আছে। কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি আপনার পাগড়ী দিয়ে আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যাব। যদি অসম্মত হন তাহলে এখান থেকেই বিদায় নেব।

দুর্জয় সিংহ এক মুহূর্ত চিন্তা করে রাজী হলেন এবং পাগড়ী খুলে যুবকের হাতে দিলেন। তারপর চোখ বাঁধা অবস্থায় প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটবার পর আবার চোখের বন্ধন হতে মুক্ত হলেন।

সামনে এক স্বল্পালোকিত পর্বত-গহ্বর, তার আশে পাশে বন্য ভীল জাতীয় লোকেরা ঘোরা ফেরা করছে। তারা পরস্পর কি বলাবলি করছে তা দুর্জয় সিংহ বুঝতে পারছে না। তাঁর মনে ঘোরতর সন্দেহ জাগল।

একজন ভৃত্য এসে তাঁকে জল দিল। তিনি হাত পা ধুলেন। আর একজন ভৃত্য এসে তাঁর সামনে ফল মূল ও অন্যান্য আহার্য সামগ্রী রাখল। দুর্জয় সিংহ চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেই অপরিচিত যুবকটি নেই। ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, আমি সেই রাজপুত যুবকের অতিথি। অতিথি সৎকারের সময় গৃহস্বামীর সামনে থাকা কর্তব্য। মনে হয়, ভীলদের সঙ্গে থেকে তিনি রাজপুত ধর্ম ভুলে গেছেন।

এই কর্কশ কথাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভৃত্যটি সবিনয়ে উত্তর দিলে, 'আমার প্রভু রাজপুতের ধর্ম ভোলেন নি। কিন্তু কোন বিশেষ ব্রতের জন্য আপাতত চন্দাওয়ৎ বংশের সঙ্গে একত্র আহারে বসা বা তাঁর সামনে থাকা নিষিদ্ধ। তাই তিনি আসেন নি।'

দুর্জয় সিংহের সন্দেহ দৃঢ় হল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এমন সময় সেই যুবক সামনে এসে বললেন, কেন যে এতক্ষণ আসি নি, তার কারণ শুনলেন, খেতে না চান তাহলে বিশ্রাম করুন। শয্যা প্রস্তুত।

দুর্জয় সিংহ বললেন, আপনি আমার যে মহা উপকার করেছেন, সে ঋণ কেমন করে পরিশোধ করতে পারি?

গম্ভীর স্বরে যুবক বললেন, আপনাকে আজ যেমন অসহায় দেখেছিলাম সেই রকম অসহায় পেয়ে যদি কোন নিরাশ্রয়া নারী বা

পিতৃহীন বালকের প্রতি কখনো অত্যাচার করে থাকেন, তাঁদের প্রতি এখন ধর্মাচরণ করুন। তাহলেই আমি তৃপ্ত হব। আমার নিজের কোন কিছু চাইবার নেই।

দুর্জয় সিংহ চমকে উঠলেন। যুবক কি পূর্ব কথা জানে? সে কি এখন এই ভীল যোদ্ধাদের দিয়ে পূর্ব অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে? দুর্জয় সিংহ বোধকরি জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, আমি সূর্য্যমহলে ফিরে যেতে চাই। আপনি কে জানি না। ইচ্ছে হয়, আপনি এইসব অসভ্য ভীলদের দিয়ে আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমি অপবাদ সইব না। রাঠোর তিলক সিংহের সঙ্গে আমার বংশগত বিরোধ। সেই বিবাদের ফলে আমি সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর সূর্য মহল দুর্গ কেড়ে নিয়েছি। এ ক্ষাত্রধর্ম মাত্র।

যুবক তেমনি ধীর কণ্ঠে বললেন, সম্মুখ যুদ্ধে আপনি সুপটু সন্দেহ নাই। তিলক সিংহ মারা গেলে তাঁরা নিরাশ্রয়া বিধবার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করে নারীহত্যা করেছিলেন।

অপমানে দুর্জয় সিংহ হুঙ্কার দিয়ে যুবককে আক্রমণ করলেন। কিন্তু যুবক নিতান্ত অবহেলা ভরে তাঁকে ধরে শূন্যে উঠিয়ে দশহাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দুর্জয় সিংহ বললেন, রাগে জ্ঞান হারিয়েছিলাম। দয়া করে আমায় সূর্যমহলে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিন।

যুবক নীরবে আবার দুর্জয় সিংহের চোখ বাঁধলেন। তারপর তাঁকে যেখান থেকে এনেছিলেন সেই পথে নিয়ে গিয়ে তাঁর চোখের বাঁধন খুলে দিলেন, দুর্জয় সিংহ কোন কথা না বলে দুর্গের দিকে চলে গেলেন।

সকাল বেলা তিনি তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তিলক সিংহের ছেলে তেজসিংহ আজো বেঁচে আছে।

মন্ত্রী বললেন, প্রভু ভুল করছেন। তিলক সিংহের বিধবা মারা

পড়লে তাঁর দশ বছরের ছেলে এই দুর্গ থেকে নীচের হ্রদে পড়ে মরেছে। তার বাঁচা অসম্ভব।

না। সে বেঁচে আছে। আজ আমি তাকে দেখেছি।

মন্ত্রী বললেন, আপনি যাকে আট বছর আগে দশ বছরের বালকরূপে দেখেছিলেন, আজ তাকে দেখে চিনলেন কেমন করে? এ যে অসম্ভব।

দুর্জয় সিং বললেন, তার মুখ দেখে চিনি নি। চিনেছি তার কথায় এবং আর এক উপায়ে। তিলক সিংহের সঙ্গে আমি একবার মল্লযুদ্ধ করেছিলাম। যে বিশেষ কৌশলে সে আমায় পরাস্ত করেছিল সে কৌশল মেওয়ারে আর কোন মল্ল জানে না। দেখলাম, সেই বিশেষ কৌশল তেজসিংহ তার বাপের কাছ থেকে শিখেছে। আরও এক কথা। তেজ সিংহ আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে।

মন্ত্রী প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে প্রভুর কথা বোধ করি বিশ্বাস করলেন না।

॥ তিন ॥

ফাল্গুন মাস। হোলী উৎসবের মাস। আবীরের রঙে রাজপথ রঞ্জিত। চন্দাওয়ৎ কুলপতি কৃষ্ণ সিংহ সালুম্ব্রার পর্বত দুর্গের সভাগৃহে এলেন। সেখানে আজ এক মহা সম্মেলন। ইতিমধ্যে দুর্জয় সিংহ প্রভৃতি অধীনস্থ যোদ্ধারা সকলেই সভায় সমবেত হয়েছেন। সকলে কৃষ্ণ সিংহকে অভিবাদন জানালেন। আসন গ্রহণ করে কৃষ্ণ সিংহ বললেন, বীরবৃন্দ! আজ এখানে সমবেত হবার কারণ আপনারা জানেন। চিতোর মোগলের হাতে, মেওয়ারের উর্বর ক্ষেত্র মোগলের অধিকারে। উত্তরে কমলমীর থেকে দক্ষিণে রুক্মনাথ পর্যন্ত পর্বত ও জঙ্গলপূর্ণ ভূভাগ মাত্র মহারাণা প্রতাপের অধীনে। মহারাজ মানসিংহ

আকবরের ছেলের সঙ্গে ধুমধাম করে মেওয়ারে আসছেন। আমরাও প্রস্তুত। অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে চণ্ডাওয়ৎ কুলও শিগগিরই মহারাণার কাছে উপস্থিত হবে। আজ হোলী। আপনাদের দেহে আবীরের রঙ। আর এক হোলীর দিন আসছে যেদিন যোদ্ধার শরীর মানুষের রক্তে রঞ্জিত হবে। আপনারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

যোদ্ধারা জয়ধ্বনি করল। সালুম্বরাধিপতি কৃষ্ণ সিংহ গম্ভীর স্বরে বললেন, যুদ্ধ বাধতে আর দেরী নেই। কালই আমরা মহারাণার বর্তমান রাজধানী কমলমীর অভিমুখে যাত্রা করব। চল সবাই আজ হোলীর উৎসবে যোগ দিই।

যোদ্ধারা হোলী খেলায় মেতে উঠল।

॥ চার ॥

কয়েকদিনের মধ্যেই চন্দাওয়ৎ কুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি সৈন্য নিয়ে মহারাণার সঙ্গে যোগ দিলেন। বেদনোরের রাঠোর বংশীয় যোদ্ধারা দলে দলে এলেন। জগওয়ৎ বংশের অধিনায়করা বহু সৈন্য পাঠালেন। দৈলওয়ারা ঝালাবংশ, বৈদলা ও কোটারি থেকে চৌহান বংশ, বিজলী থেকে প্রমার বংশ এবং অন্যান্য রাজবংশের যোদ্ধারা এসে প্রতাপ সিংহের পাশে দাঁড়ালেন।

আজ ফাল্গুন মাসের শেষ দিন, বসন্তোৎসবেরও শেষ দিন। উৎসব-স্থল থেকে বহুদূরে একটি অন্ধকারময় পর্বতস্থলীর উপর একজন যোদ্ধা একাকী পদচারণা করছিলেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহের কোমরে তরবারি। যোদ্ধার সাজ। কাছে গাছের তলায় তাঁর তৃণশয্যা পাতা রয়েছে। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ততদিন তিনি তৃণ শয্যায় শয়ন করবেন, সোনারূপা স্পর্শ করবেন না, জটাশ্মশ্রু মোচন করবেন না, বৃক্ষপত্র

ভিন্ন অন্ত পাত্রে আহার করবেন না। বোধ করি প্রাচীন ভারতের কোন মুনি-ঋষিও তাঁর চেয়ে কঠিন ব্রত ধারণ করেননি।

প্রতাপ সিংহ আজ গভীর চিন্তামগ্ন। কাল সকালেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে—হলদীঘাটার যুদ্ধ।

পরদিন সকালেই যুদ্ধ শুরু হল। ইতিহাসের বিখ্যাত তুমুল সংগ্রাম। তার বিবরণ ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে, লেখা আছে রাজপুত সৈন্যের অবিশ্বাস্য বীরত্ব-কাহিনী।

বহু শত্রু সৈন্য বধ করে প্রতাপ সিংহ শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেন। প্রভুর বিপদ বুঝে তাঁর ঘোড়া চৈতক তাঁকে নিয়ে রণস্থল ছেড়ে চলে গেল। তু'জন মোগল সৈন্য তাঁকে বধ করতে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটল। প্রতাপ আহত, পরিশ্রান্ত। নদীর তীরে এসে তাঁর ঘোড়া চৈতক পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালো।

মোগল সৈন্য তু'জন প্রতাপকে আক্রমণ করলো। এমন সময় প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ, যিনি দাদার বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে আকবরের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি সেখানে এসে মোগল তু'জনকে বধ করে দাদাকে রক্ষা করলেন।

॥ পাঁচ ॥

হলদীঘাটের যুদ্ধের পর তুর্জয় সিংহ সূর্যমহলে ফিরে এসেছেন। আজ আবার সভাগৃহে সভা বসেছে। সভায় সকলে যুদ্ধের কথা বলছেন, এমন সময় এক যুবা চারণ একটি গান গাইবার অনুমতি চাইলেন। তুর্জয় সিংহ চারণকে চিনতে পারলেন না। গান গাইবার অনুমতি দিলেন।

চারণ গাইলেন—এই সূর্যমহল তুর্গ কার? যারা বংশানুক্রমে রক্ষা করে এসেছে তাদের, না, যে তস্করের মত অপহরণ করেছে তার?

যে নারী দুর্গ রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেছে তার, না, যে নারীহত্যা করে দুর্গ অধিকার করেছে তার? যে বালকের সম্পত্তি চুরি করে তার, না, যে বালক আজ পর্বত কন্দরে বাস করে, তার?

গান শুনে দুর্জয় সিংহ ভ্রূকুটি করলেন। তারপর দেখা গেল যুবক চারণ কখন সভাস্থল ছেড়ে চলে গেছে। দুর্জয় সিংহ বুঝলেন, তিনি আজ আবার তেজ সিংহের দেখা পেলেন।

দুর্জয় সিংহের প্রাসাদের অনতিদূরে একটি ফুলের বাগানে রাত্রে এক রাজপুত বালিকা একাকী বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর নাম পুষ্পকুমারী।

সহসা কে যেন বলে উঠল—পুষ্প!

বালিকা চমকে উঠলেন। কিন্তু কারুর দেখা পেলেন না। কে তাঁর নাম ধরে ডাকল? একটু দূরে গিয়ে দেখলেন, এক চারণ বীণা বাজিয়ে গান করছে।

পুষ্প তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলেন।

চারণ গাইছিল—সাত বছরের এক বালিকা দশ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে খেলাচ্ছলে সত্য করলেন যে সেই রাঠোর বালক ভিন্ন তিনি আর কাউকে পতিত্বে বরণ করবেন না। তারপর সেই বালক কোথায় গেল কেউ জানল না। বালিকার অন্য জায়গায় বিবাহ স্থির হল। কিন্তু মেয়েটি তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমি এক রাঠোর বীরকে সত্যদান করেছি। মৃত্যুবরণ করব, কিন্তু সত্য ভঙ্গ করব না।

পুষ্প চারণের কাছে গিয়ে বললেন, এ গান আপনি কোথায় শিখলেন? সেই রাঠোর বীর কি বেঁচে আছেন?

চারণ বললেন, দেবী! রাঠোর বীর তেজ সিংহ আমাকে এই গান শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এই আংটীটি দিয়ে আদেশ করেছিলেন, এই গানে যাঁর নাম আছে যদি তাঁর দেখা পাও তো আংটীটি তাঁর আঙুলে পরিয়ে দিও। আপনিই যদি তিনি হন তাহলে অনুমতি করুন, আংটী পরিয়ে দি।

লজ্জাবতী পুষ্প তাঁর কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিলেন।

চারণ ধীরে ধীরে সেই আংটী পুষ্পের আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

পুষ্প বললেন, সেই বীরপুরুষকে প্রতিদান দিতে পারি আমার এমন কিছু নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে এই ফুলটি তাঁকে দেবেন।

॥ ছয় ॥

পুষ্পর পিতার সঙ্গে তিলক সিংহের খুব বন্ধুত্ব ছিল। সেজন্যে তিলক সিংহ নিজের ছেলের সঙ্গে পুষ্পর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু আকবর চিতোর আক্রমণ করলেন। পুষ্পর বাবা এবং তিলক সিংহ দু'জনেই দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়লেন। কিছুদিন পরে তেজ সিংহ পৈতৃক দুর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভীলদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

তিলক সিংহের বংশের আরো অপমান করার জন্যে দুর্জয় সিংহ তেজ সিংহের বাকদত্তা বধূকে বলপূর্বক বিবাহ করতে চাইলেন।

পুষ্পকুমারীর রক্ষায় যারা ছিল তারা সকলেই দুর্জয় সিংহের অনুগত। তাদের সাহায্যে তিনি পুষ্পকুমারীকে সূর্যমহল দুর্গে আনলেন। কিন্তু পুষ্প কিছুতেই তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন না।

তারপর ভাগ্যক্রমে পুষ্পকুমারী সূর্যমহল থেকে উদ্ধার পেয়ে চিতোরের মহারাণীর সহচরী হলেন।

এদিকে তেজসিংহ সূর্যমহল আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল। এবং সেই যুদ্ধে দুর্জয় সিংহ প্রাণ হারালেন।

অতঃপর পুষ্পকুমারীর সঙ্গে তেজসিংহের মিলন হল এবং স্বয়ং মহারাণার উদ্যোগে দুজনের বিবাহ সম্পন্ন হল।

॥ সাত ॥

১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে বনের ধারে এক পর্ণকুটিরে প্রতাপ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এতদিন তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বনে বনে কাটিয়েছেন

অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন, অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বারবার মোগল সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছেন—কিছুতেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

তারপর সম্রাট আকবর প্রায় আট বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু মেওয়ার জয়ের জন্যে কোন উদ্যোগ করেন নি। প্রতাপ সিংহের প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে মেওয়ার বিজয়ের উদ্যোগ করলেন। প্রতাপের পুত্র অমর সিংহ দীর্ঘ ষোল বছর লড়াই চালালেন।

জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভাই সাগরজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করে চিতোরে পাঠালেন। ভাইপো অমর সিংহ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করছে আর তিনি নিজে মোগলের অধীনে চিতোর দুর্গ রক্ষা করছেন —এ চিন্তা সাগরজী সহ্য করতে পারলেন না। ভাইপোকে চিতোর দুর্গ দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন।

এতদিনে চিতোর উদ্ধার হলো বটে কিন্তু আর স্বাধীনতা রক্ষা করা গেল না। মোগলের অবিরাম আক্রমণে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে অমর সিংহ মোগলের অধীনতা স্বীকার করলেন এবং নিজের ছেলে করুণ সিংহকে দিল্লীর দরবারে পাঠালেন। সেখানে সম্রাট জাহাঙ্গীর যুবরাজ করুণ সিংহকে বিশেষভাবে সমাদর করলেন।

করুণ সিং ফিরে এলে অমর সিংহ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করে বললেন, স্বাধীনতা হারিয়েছি, এ দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না। আজ থেকে তুমি মহারাণা হলে। আমি বৃদ্ধ, বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলাম।

অমর সিংহ তার পরদিনই রাজধানী ত্যাগ করে নচৌকী নামক স্থানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। তারপর তিনি পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আর রাজধানীতে আসেন নি, রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নি।

নীলদর্পণ

[আজ উপন্যাসে নাটকে আমরা দরিদ্র নিপীড়িত গ্রাম্য কৃষক, মজদুর প্রভৃতি মানুষের ব্যথা বেদনার কথা বলবার প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে আজ থেকে একশ দশ বছর আগে এক বাঙালী লেখক (নাট্যকার) তাঁর এক নাটকে চাষী এবং গ্রামবাসীদের উপদ্রুত, অত্যাচারে বিধ্বস্ত, সর্বস্বান্ত জীবনের কথা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন আজও যা আমাদের মনকে নাড়া দেয়।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' এক কালজয়ী নাটক। এই নাটক নিয়েই একশ বছর আগে ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর বাংলার পেশাদারী মঞ্চ তার যাত্রা সুরু করে। নীলদর্পণ শুধু নাটক নয়। সেই সময়কার নীলকুঠির পশু চরিত্র সাহেবগুলোর অত্যাচারের যেন এক প্রামাণ্য দলিল। নীলদর্পণের প্রভাবে সারা দেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবং তাতে সুফল দেখা গিয়েছিল। একটি নাটকের যে কত জোর কত তার প্রভাব—বাংলার প্রথম গণ-নাটক নীলদর্পণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।]

॥ এক ॥

বেগুনবেড়ের কুঠি নীলকর সাহেবদের একটা বড় ঘাঁটি। তিন বছর হল এর পত্তন হয়েছে। এই কুঠির এলাকায় আছে স্বরপুর গ্রাম। দুই সাহেব সেখানকার কর্তা। একজনের নাম উড, অন্যজনের নাম রোগ্। অত্যন্ত সাংঘাতিক দুই বদমাস। যেমন দুর্দান্ত তাদের দাপট, তেমনি দুর্জয় তাদের ক্ষমতা। অত্যাচার আর অবিচার চালাতে তাদের জুড়ি নেই।

কয়েক মাসের মধ্যে তাদের অত্যাচারে সোনার স্বরপুর গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছে। অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়ে সাত পুরুষের

ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়েছে। যারা রয়েছে তারাও যে কোনদিন পালাতে পারে—এমনি অবস্থা।

কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে কারুরই রেহাই নেই। হোক সে সামান্য গরীব চাষী, অথবা সম্পন্ন গৃহস্থ!

মোড়লদের দু'ভাই ক'দিন হল ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। ধানী জমিতে নীলের চাষ করতে চায়নি বলে তারা অমানুষিক মার খেয়েছে। অন্য ভাইটিও পালাই পালাই করছে।

নীলকরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাধুচরণ আর রাইচরণ দু'ভাই এ গাঁয়ে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে একই হাল হল তাদের। কিছুদিন আগে ন' বিঘে ধানী জমিতে নীল চাষ করতে হবে বলে কুঠির আমিনরা দাগ দিয়ে গেছে।

এ গাঁয়ের গোলক বসু ছিলেন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ। উদ্বৃত্ত ফসল। চাল, ডাল, গুড়, তরিতরকারী, পুকুরের মাছ—কিছুই কিনে খেতে হয় না।

তার দুই ছেলে। বড় নবীনমাধব স্বরপুরেই থাকে। ছোট নীলমাধব ইন্দ্রাবাদে থেকে লেখাপড়া করছে। সুখের সংসার।

গত বছর গোলকবাবুকে বাধ্য হয়ে পঞ্চাশ বিঘে জমিতে নীল চাষ করতে হয়েছিল। এবারেও বেগুনবেড়ে কুঠির আমিন এসে আরও ষাট বিঘে জমিতে নীল চাষের জন্যে মার্কা দিয়ে গেছে।

নবীনমাধব বাধা দিয়েছিল। ফলে তাকে পেয়াদারা ধরে নিয়ে যায়। তেজস্বী নবীনমাধব বলেছিল—আমার গত বছরের পাওনা টাকা চুকিয়ে না দিলে এ বছর এক ছটাক জমিতেও নীল চাষ করব না—প্রাণ যায় তাও স্বীকার।

সাহেবরা বলেছে, এতবড় কথা। যদি সাহেবদের কথা অমান্য

করে তাহলে নবীনমাধবের বাড়ী উপড়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। তাকে আজীবন কয়েদ করে রাখবে।

এইসব নিয়ে সেদিন গোলক বসুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সাধুচরণের কথাবার্তা হচ্ছিল।

সাধুচরণ গোলকবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, ধন তো গেছে, এবার মানও যাবে। তা যাবার আগে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু গোলক বসু রাজী নন। সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে তিনি পালাবেন না।

বাড়ি ফিরে এসে সাধুচরণ ছোট ভাই রাইচরণের মুখে শুনল, আমিন সাপোলতলার জমিতে দাগ মেরে গেছে। অনুনয়ে বিনয়ে এমন কি টাকার বিনিময়েও কোন ফল হয়নি দেখে রাইচরণ শাসিয়ে এসেছে—মামলা করবে সে।

এই সাপোলতলার জমিই তাদের একমাত্র ভরসা। এও গেলে সবাইকে উপোস করতে হবে।

এমন সময় দু'জন পেয়াদা সঙ্গে করে আমিন এসে ঢুকল সাধুচরণের বাড়ি।

পেয়াদারা এসেই রাইচরণকে বাঁধলো।

তা দেখে সাধুচরণের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে বললে, বড়বাবু নবীনমাধববাবুকে ডেকে আনো।

বাধা দিল আমিন, খবরদার! কেউ কোথাও যেতে পারবে না, সই করে দাদন আনতে হবে। রাইচরণটা মূর্খ, সই সাবুদ করতে জানে না। তাই সাধুচরণকেই সই করে দাদন আনতে হবে।

সাধুচরণের স্ত্রী আমিনকে বললে, ওদের দুটি খেয়ে যেতে দাও। কুঠিতো অনেক দূর!

আমিন খেঁকিয়ে উঠল। পেয়াদাদের হুকুম দিলে, দু'জনকেই এখনি বেঁধে নিয়ে চল।

॥ দুই ॥

বেগুনবেড়ে কুঠির বারান্দায় বসে সেদিন নীলকর উড দেওয়ান গোপীনাথ দত্তকে গালাগাল দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে "শ্যামচাঁদের" ভয়ও দেখাচ্ছিল।

শ্যামচাঁদ হল এক প্রকার চাবুক, যা দিয়ে বর্বর সাহেবগুলো গরীব চাষীদের ঠেঙাতো।

গোপীনাথ লোকটা অতি বদ। বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। তাতেও সাহেব খুশী নয়।

স্বরপুর, শ্যামনগর, শাস্তিঘাটা, এর কোনটাতেই নাকি মনমত দাদন হয়নি।

পেশকার থেকে দেওয়ান হয়েছে গোপীনাথ। আরও উন্নতির আশা রাখে। হাত কচলে বললে, আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করছিনা হুজুরদের জন্যে। কিন্তু নবীনমাধব বড় শত্রুতা করছে। ওর জন্যেই তো পলাশপুর গ্রাম জ্বালানো প্রমাণ হয়ে যায়। ফলে আগেকার দেওয়ানের শাস্তি হয়, কত বারণ করেছি তাকে, এসবে থেকো না। তা, বলে কিনা, নীলকরের নিষ্ঠুর কবল থেকে একজন চাষীকেও যদি বাঁচাতে পারি তাহলে বহু ভাগ্য বলে মনে করব।

এমন সময় আমিন সাধুচরণ আর রাইচরণকে নিয়ে হাজির হল।

সাধুকে দেখেই গোপীনাথ বলে উঠল, ওই আর একজন কুঠির মস্ত শত্রু। নবীনমাধবের সঙ্গে যোগসাজস করে নীলের শত্রুতা করছে।

সধুচরণ জবাব দিল, নীলের শত্রুতা করবার ক্ষমতা কি আমার

আছে। তবে কিনা, যতটা সয় ততটা হলেই ভাল। আর আঙুল চুংগিতে আট আঙুল বারুদ দিলেই ফাটে।

সাহেব হুমকি দিয়ে বললে, বিশ বিঘে জমিতে তোর চাষ, ন' বিঘেতে নীল করে বাকি এগারো বিঘেতে ধান কর না!

সাধুচরণ বুঝিয়ে বলতে গেল যে, ন' বিঘে নীলের চাষে তার সব লাঙ্গলগুলো লেগে যাবে, আর কোন চাষ করাই তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। উড সাধুচরণকে জুতোর ঠোকর মেরে বলে উঠল: শুয়ার কা বাচ্চা, শুনতে চাই না কোন অজুহাত।

তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে দেওয়াল থেকে শ্যামচাঁদ নামিয়ে আনল।

তাই দেখে দু'ভাই সন্ত্রস্ত হল।

রাইচরণ রেগে বলে উঠল, লিখে দে দাদা, যা বলে লিখে দে।

কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। শ্যামচাঁদ পড়ল রাইচরণের পিঠে। রাইচরণ আর্তনাদ করে উঠল।

এমন সময় নবীনমাধব সেখানে এসে উপস্থিত হল। সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, এইভাবে রাইয়তদের মারধর করলে কুঠিরই ক্ষতি হবে। মারের ভয়ে এরা পালিয়ে যাবে।

সাহেব বলে উঠল। যাও, যাও, তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে। বল্ সাধু, কি বল্‌বি বল্। আমার সময় নেই।

সাধুচরণ বললে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে জমি নিয়েছেন। নীলও সেই রকম হবে।

এই কথা শুনেই সাহেব রেগে আগুন।

কি বললি, শালা, বজ্জাত, বেইমান!

এই বলে সাহেব সাধুর উপর শ্যামচাঁদ চালাতে লাগল।

নবীনমাধব বাধা দিয়ে বললে, করেন কি! আপনাকে যদি কেউ অমনি মারতো, তাহলে কেমন লাগত!

সাহেব গর্জে উঠল, চোপরাও শালা! তুই ষাট বিঘে জমি লিখে দিয়ে দাদন না নিলে এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায়ও ভাংবো।

নিরুপায় নবীনমাধব অপমানিত হয়ে বেরিয়ে এল। তারপর ওদের দুই ভাইকে দাদন লিখিয়ে নিতে নিয়ে যাওয়া হল।

॥ তিন ॥

গোপীনাথের পরামর্শে নীলকর সাহেবরা গোলক বসুর নামে মিথ্যা মামলা রুজু করল।

এইবার যদি নবীনমাধব জব্দ হয়।

কত উৎপাত, কত ঝড় ঝাপটা গেছে। নবীনমাধব দমেনি। কিন্তু এবারে ভারী উদ্বিগ্ন আর দিশাহারা হয়ে পড়ল।

নিরীহ বৃদ্ধ পিতা। কারুর সাতে পাঁচে থাকেন না। যতটা পারেন পরের উপকারই করেন। জেল হোলে আর বাঁচবেন না। উপরন্তু তাঁর পুকুর পাড়ে নীলের চাষ দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের আব্‌রু নষ্ট হবে। মেয়েরা পুকুরে যেতে পারবে না।

আপত্তি করায় নবীনমাধবকে উড সাহেব বলেছে, তোমাদের ভিটা উঠে গেলেই সেই জমিতে অনেক নীল হবে।

গোলক বসুর বিরুদ্ধে মামলা আনলেই তো হবে না। সাক্ষ্য প্রমাণ তো চাই। তা কোথায়?

চাষীরা কেউ গোলকবাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। মামলার কথা শুনে কেউ ফেরার হল।

বহু কষ্টে তোরাপ আর চারজনকে কুঠির গুদামে বেঁধে নিয়ে আসা হল।

প্রথমে কেউই রাজী হয় নি। তাই শ্যামচাঁদের প্রহারে আর বুটের গুঁতোয় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত চারজন রাজী হয়েছে। কিন্তু তোরাপ তবুও রাজী হয়নি।

রোগ্‌কে সঙ্গে নিয়ে গোপীনাথ এলো সেখানে।

রোগ্‌ জিজ্ঞেস করলে, রাজী হয়নি কে কে?

গোপীনাথ দেখিয়ে দিল, এই তোরাপ, বলে কি না, নিমক-হারামি করতে পারবো না।

এই কথা শুনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তেড়ে এলো রোগ্‌ সাহেব। বুটের গুঁতো মারে আর কি!

তোরাপ ভাবল, মুখে রাজী হয়েছি বললে তো মারের হাত থেকে রেহাই পাব। বললে, হ্যাঁ, আমিও রাজী।

রোগ্‌ গোপীনাথকে বললে, যতক্ষণ এদের এজাহার আদায় না হয় ততক্ষণ কাউকে ছাড়বে না। সব বজ্জাত হ্যায়।

বেগুনবেড়ে কুঠির দুই সাহেব স্বরপুরের দু'জনকে নিয়ে পড়েছে।

উড্‌ গোপীনাথের পরামর্শ নিয়ে নবীনমাধবের সর্বনাশ করতে উদ্যত।

রোগ্‌ ব্যস্ত আমিনের সাহায্যে সাধুচরণকে সায়েস্তা করতে।

॥ চার ॥

নবীনমাধবের চিন্তার অন্ত নেই।

পিতা মোকর্দমায় ফেঁসেছেন। কী যে হবে বলা যায় না।

মামলা লড়তে হবে। কিন্তু আজ তার হাতে টাকাকড়ি কিছু নেই।

এককালে এমনি দশটা মামলার ব্যয় সংগ্রহ করতে তার কষ্ট হত না।

আজ নীলের অত্যাচারে সামান্য একটি মামলার খরচ চালানোর ক্ষমতা তার নেই। কত লোকের কাছেই তো গেল। কেউ টাকা দিলে না।

নবীনমাধবের স্ত্রী এসে বললে, আমার আর ছোট বউ এর গয়না বেচে শ্বশুরমশাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো।

কিন্তু তাতে নবীনমাধব রাজী হতে পারেনি।

এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল আর্তনাদ।

ক্ষেত্রমণির মা কাঁদছে আর বলছে, ওগো, বড়বাবু, আমার ক্ষেত্রমণিকে এনে দাও গো'

কী হয়েছে! ব্যাপার কি!

জানা গেল, গ্রামের মেয়ে ক্ষেত্রমণি দাস পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল, কুঠির লেঠেল দিয়ে সাহেব তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

নবীনমাধব সব ভুলে ছুটে গেল।

গাঁয়ের মেয়েদের ইজ্জত আর রইল না। এ অত্যাচার সে সইবে না।

পথে দেখা হয়ে গেল তোরাপের সঙ্গে। ফটকের জানলা ভেঙে সে পালিয়ে এসেছে।

দুজনে মিলে ছুটে গেল কুঠির দিকে। জানলার খড়খড়ি ভেঙে রোগ্ সাহেবের কামরায় ঢুকল।

রোগ্ তখন ক্ষেত্রমণির উপর অত্যাচার করতে উদ্যত।

ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে নিয়ে নবনীমাধব রোগ্‌কে বলল, এই ছোট মেয়েটার উপর তোমার এই অত্যাচার। তুমি না খৃষ্টান!

তোরাপের এসব কথা, উপদেশ ভাল লাগছিল না। "যেন কুকুর তেমনি মুগুর" বলে সে রোগের গলা টিপে ধরল।

"পাঁচ দিন চোরের, একদিন সাধুর"—এই বলে সে সাহেবের কান মুচড়ে দিল সজোরে। এর ফাঁকে নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

তারপর হাঁটুর গুঁতোয় সাহেবকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে তোরাপও অদৃশ্য হল।

॥ পাঁচ ॥

ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিসস্ট্রেট হলেন উড্ সাহেবের বন্ধু।

সেইজন্যই গোলকবাবুর বিচার-প্রহসন সহজেই শেষ হল। জেল হল তাঁর।

বিচারের ফল শুনে গোলকবাবু সেই যে চোখে হাত দিলেন, তিন দিন ধরে তা আর নামান নি। পাপমুখে কিছু খানও নি।

তিন দিন পার হয়েছে। আজ রাতে গোলক বসু আহার করবেন।

হঠাৎ ইন্দ্রাবাদ থেকে ছোট ভাই নীলমাধব নবীনমাধবকে জরুরী খবর পাঠালো—নবীনমাধবকে এখনি সেখানে যেতে হবে।

নবীনমাধব ইন্দ্রাবাদ পৌঁছে দেখল, তার বাবা আত্মহত্যা করেছেন।

নবীনমাধবের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। এত করেও সে তার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না।

নবীনমাধবের বাড়ি স্তব্ধ, শোকাচ্ছন্ন।

শ্রাদ্ধ শেষ হলেই গাঁ ছেড়ে চলে যাবে, ঠিক করেছে নবীনমাধব।

পুকুর পাড়ে নীলের চাষ এ বছরের মত স্থগিত রাখবার জন্য সে উড্ সাহেবকে গিয়ে অনুরোধ জানালো।

সাধুচরণ আর তোরাপও তার সঙ্গে গেল।

নবীনমাধব পঞ্চাশ টাকা সেলামিও দিতে চাইল।

উড্ বললে, টাকা রেখে দে। তোর বাপের শ্রাদ্ধে ষাঁড় কাটতে হবে। তখন টাকা লাগবে।

এই বলে উড্ নবীনমাধবকে লাথি মারল।

সঙ্গে সঙ্গে নবীমমাধবও পালটা লাথি চালালো। সেই লাথি খেয়ে উড্ চিৎপাত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দশ বারো জন সড়কিওয়ালা নবীনকে মারবার জন্য তাকে ঘিরে ফেললো।

তারই মধ্যে উড একটা লাঠি নিয়ে নবীনের মাথায় সজোরে মারলো।

পড়ে পেল নবীনমাধব। সেই ভীড় ঠেলে ভিতরে গেল তোরাপ।

তোরাপকে দেখেই তাকে তলোয়ারের কোপ মারতে গেল উড। ঠেকাতে গিয়ে তোরাপের হাত কেটে গেল। আর তলোয়ারের খোঁচা লাগল গিয়ে নবীনমাধবের বুকে।

তোরাপ তখন এক কামড়ে সাহেবের নাক ছিঁড়ে নিয়ে নবীন-মাধবকে কোলে করে বসু বাড়ির দিকে ছুটল।

সব দেখেশুনে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন নবীনমাধবের মা। মূর্চ্ছা ভাঙবার পর ঘোর উন্মাদে পরিণত হলেন। কখনো কাঁদেন, কখনো হাত তালি দেন।

নবীনমাধবের জীবন রক্ষা করা গেল না। দেখতে দেখতে তার মৃত্যু হল।

বসু পরিবারে একের পর এক নেমে এলো মৃত্যুর করাল ছায়া।

নীলকরদের অত্যাচারের ফলেই বাংলাদেশের অমন একটি সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল।

* * *

রাণা প্রতাপ সিংহ

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণা প্রতাপ সিংহ একটি সর্বকালজয়ী নাটক। এই নাটকে শুধু যে দেশপ্রেমের চরম প্রকাশ দেখা গেছে তাই নয়, চরিত্র-চিত্রণ এবং মতস্তত্ত্বের ঘাত-প্রতিঘাতের দিক থেকেও নাটকটি অসামান্য। রাণা প্রতাপ সিংহ নাটকটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটকাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়।]

। এক ।

অন্যায় যুদ্ধে গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ করে সম্রাট আকবর চিতোর অধিকার করেছেন। চিতোরের সন্নিহিত কমলমীরের বনের মধ্যে রাণা প্রতাপ তাঁর অনুচরবৃন্দকে কালীমূর্তির সামনে শপথ গ্রহণ করালেন যে, যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ততদিন ভূর্জপত্রে ভক্ষণ করবেন সবাই, তৃণশয্যায় শয়ন করবেন, বংশ পরম্পরায় মোগলের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হবেন না, প্রাণান্তেও মোগলের দাসত্ব করবেন না এবং তরবারিই মোগল ও তাঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যবধান থাকবে।

শপথ গ্রহণের পর সবাই চলে গেলেন। তারপর এলেন প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ। প্রতাপ বললেন, শক্ত, তুমি কালীর পূজো দিলে না?

শক্ত জবাব দিলেন, পূজো? না দাদা, পূজোয় আমার বিশ্বাস নেই। পূজো দিয়ে কিছু হয় না দাদা। মা-কালী ঐ জিভ বার করেই আছেন—মূক, স্থির। কোন ক্ষমতা নেই, প্রাণ নেই।

ছোট ভাই-এর কথা শুনে প্রতাপ ব্যথা পেলেন। তারপর সেখান থেকে কার্যান্তরে প্রস্থান করলেন।

এই শক্ত সিংহের জীবন বড় বিচিত্র। তাঁর কোষ্ঠীতে নাকি ছিল, তিনিই একদিন মেবারের সর্বনাশের কারণ হবেন। সেই কোষ্ঠীতে কথা বিশ্বাস করে তাঁর পিতা উদয় সিংহ তাঁকে বধ করবার হুকুম দেন। শক্তকে রক্ষা করেন সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ। তিনি শক্তকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে তাঁর রাজ্যে নিয়ে গিয়ে রাখেন। তারপর গোবিন্দ সিংহের পুত্র জন্মায় এবং শক্ত সিংহ অনাদরে দিন কাটাতে থাকেন। প্রতাপ সিংহ রাণা হবার পর ছোট ভাইকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন।

কিন্তু শক্ত সিংহ মনে মনে খুশী নন মোটেই। কেন প্রতাপ মেবারের রাণা আর তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ? তিনি আর প্রতাপ এক পিতারই পুত্র। প্রতাপ জ্যেষ্ঠ আর তিনি কনিষ্ঠ। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না।

এইরকম মনোভাব নিয়ে শক্ত সিংহের চরিত্র গড়ে উঠেছিল।

শপথ গ্রহণের পরদিন দুই ভাই-এ শিকার করতে গেলেন। কিন্তু শিকার পাওয়া গেল না। তখন শক্ত সিংহ বললেন, কে ভাল ভল্ল নিক্ষেপ করতে পারে—তুমি না আমি, জন্তুর উপর যখন তার পরীক্ষা করা গেল না, তখন এসো, পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ অবাক হয়ে বললেন, সেকি কথা?

শক্ত সিংহ জিদ ধরলেন। পরীক্ষা করতেই হবে। প্রমাণ হয়ে যাক।

অগত্যা প্রতাপ সিংহ তরবারি মাটিতে রেখে বর্শা তুলে নিলেন। শক্ত সিংহও তাই করলেন।

দু'জনে দু'জনকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়তে যাবেন এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত ছুটে এসে বললেন, করছ কি তোমরা! ভাই-এ ভাই-এ হানাহানি!

শক্ত সিংহ চিৎকার করে বললেন, ব্রাহ্মণ, দূরে থাক। নইলে

তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। আজ নররক্ত নিতে বেরিয়েছি, নররক্তর চাই।

পুরোহিত বললেন, নররক্ত চাও? বেশ, আমি দিচ্ছি, এই নাও।

এই বলে তিনি শক্ত সিংহের তরবারি তুলে নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, এই নররক্ত দিলাম। তোমরা শান্ত হও।

ক্ষোভে, দুঃখে আর্তনাদ করে প্রতাপ সিংহ বললেন, শক্ত, তোমার জন্যেই ব্রহ্মহত্যা হল, তুমি এই মুহূর্তে আমার রাজ্য থেকে চলে যাও।

নতমস্তকে চলে গেলেন শক্ত সিংহ।

॥ দুই ॥

প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষায় শক্ত সিংহ সম্রাট আকবরের কাছে গেলেন এবং তাঁর জীবনের সকল বৃত্তান্ত বলে আকবরের সৈন্যদলে যোগ দিলেন। আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

অন্তঃপুরে বসে আকবরের কন্যা মেহের উন্নিসা এবং ভাগিনেয়ী দৌলত উন্নিসা সেই যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনলেন।

মেহের উন্নিসা যেমন কৌতুকপরায়ণা তেমনি বাকপটু। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর চরিত্রের গভীরতাও কম নয়।

দৌলত উন্নিসা মেহেরের চেয়ে ছোট, অপরূপ সুন্দরী। লাজনম্রা, সরলা।

মেহের আর দৌলত নিজেদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করছেন, এমন সময় সেখানে এলেম যুবরাজ সেলিম। সেলিম যুদ্ধের কথা জানালেন। শুনে মেহের বললেন, তারাও যুদ্ধ দেখতে যাবেন।

সেলিম তো অবাক! মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে কি!

কিন্তু মেহের নাছোড়বান্দা। বললে, সম্রাটের সম্মতি তিনি আদায় করবেন। সেজন্যে সেলিমের চিন্তার কোন কারণ নেই।

সত্যিই মেহের ও দৌলত যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন এবং সেলিমের শিবিরের পাশে অন্য একটি শিবিরে অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন দু'জনে সেলিমকে খুঁজতে তাঁর শিবিরে গিয়ে ঢুকেছেন, এমন সময় সেখানে এসে প্রবেশ করলেন শক্ত সিংহ। তিনি জানবেন কি করে যে সেলিমের শিবিরে দুইজন মহিলা রয়েছেন। তাঁদের দেখেই—"আপনারা! আমি জানতে পারিনি। মাফ করবেন"—বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

দৌলত মুগ্ধবিস্ময়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে উনি?

মেহের শক্ত সিংহের পরিচয় দিয়ে দৌলতকে নিয়ে নিজেদের শিবিরে চলে গেলেন।

পরদিন মেহের উন্নিসা গেলেন শক্ত সিংহের শিবিরে। শক্ত সিংহ আপন চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এমন সময় মেহেরকে তাঁর শিবিরে দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, আপনি?

মেহের নিজের পরিচয় দিলেন। শুনে অধিকতর বিস্মিত হয়ে শক্ত বললেন, আপনি সম্রাটের কন্যা? আপনি যে আমার শিবিবে?

মেহের উন্নিসা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি প্রতাপ সিংহের ভাই! আপনি যে তাঁর বিপক্ষ শিবিরে?

মেহেরের কথা শুনে শক্ত বিস্মিত, অপ্রস্তুত!

মেহের তখন শক্ত সিংহের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় বললেন, তাঁর ভগ্নী দৌলতউন্নিসাও এসেছে। অপরূপ সুন্দরী তাঁর সেই বোনটি।

এই বলে মেহের পাশের শিবির থেকে দৌলতউন্নিসাকে নিয়ে এলেন।

দৌলতকে দেখে মুগ্ধ হলেন শক্ত সিংহ। দৌলত উন্নিসাও প্রথম দর্শনেই শক্ত সিংহের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

মেহের উন্নিসা তাঁদের দু'জনকেই কিছুক্ষণ রঙ্গ-রসিকতায় বিব্রত করলেন। তারপর ভগ্নীকে নিয়ে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

হলদিঘাটের যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীষণ যুদ্ধ! প্রতাপের সৈন্যবল সামান্য: সে তুলনায় মোগল সৈন্য সংখ্যাতীত!

সেই অসম যুদ্ধের ফলে প্রতাপের অনেক সৈন্য মারা পড়ল। প্রতাপকে রক্ষা করবার জন্য ঝালাপতি মানা সিংহ প্রাণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতাপের প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতক প্রভুকে বাঁচাবার জন্য শত্রুব্যূহ ভেদ করে ছুট দিল।

প্রতাপ রণক্ষেত্রে থেকে চলে যাচ্ছেন দেখে সেলিম তাঁর দুই অনুচরকে আদেশ করলেন, প্রতাপ সিংহের পশ্চাদ্ধাবন কর। তাঁর শির চাই, রাণা প্রতাপের মুণ্ড চাই।

পাশের শিবির থেকে শক্ত সিংহ সেলিমের সেই চিৎকার শুনতে পেয়ে, তিনিও ছুটলেন প্রতাপের পিছনে।

ছুটতে ছুটতে ক্ষতবিক্ষত দেহ চৈতক শেষ পর্যন্ত মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং মারা গেল।

নদীর ধারে প্রিয় ঘোড়ার পাশে শুয়ে প্রতাপ আক্ষেপ করছেন, কেন তাঁর ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এলো। সকলে ভাবল, প্রতাপ প্রাণভয়ে যুদ্ধ না করে পলায়ন করেছে।

এমন সময় সেখানে এলো সেলিমের সেই দুই রক্তপিপাসু অনুচর, খোরাসান ও মুলতাম। তারা প্রতাপকে ঘিরে তাঁকে মারবার উদ্যোগ

করছে এমন সময় শক্ত সিংহ এসে তাদের বাঁধা দিলেন। তখন তারা শক্ত সিংহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনের সঙ্গে এক তুমুল যুদ্ধ করে শক্ত সিংহ দু'জনকেই বধ করলেন। তারপর তিনি প্রতাপের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রতাপ মনে করলেন, শক্ত সিংহ তাঁকে বন্দী করে মোগলদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছেন। তিনি বললেন, শক্ত, আমি তবে তোমার হাতে বন্দী। আমি তোমায় মিনতি করছি, আমায় বেঁধে নিয়ে যেও না। তার চেয়ে আমায় বধ করে আমার ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে গিয়ে তোমার মনিব আকবরকে উপহার দাও। বেঁধে নিয়ে যেও না, বধ কর। এই প্রসারিত বক্ষে তোমার তরবারি হানো।

শক্ত সিংহ হাতের তলোয়ার ফেলে দিয়ে আবেগ-কম্পিত স্বরে বললেন, তোমার ঐ প্রসারিত বক্ষে আমায় স্থান দাও দাদা। বীরের আদর্শ স্বদেশের রক্ষক, রাজপুর কুলের গৌরব, তুমি কত বড়, এতদিন তা বুঝিনি! নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্বনাশ করেছি। কিন্তু যখন তোমাকে রক্ষা করতে পেরেছি, তখন এখনও মেবারের আশা আছে। রাজপুত কুলপ্রদীপ! বীরকেশরী! পুরুষোত্তম! আমাকে ক্ষমা কর।

শক্ত সিংহের অন্তরের উচ্ছ্বাস শুনে বিহ্বল হলেন প্রতাপ সিংহ। কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে শক্ত সিংহকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

॥ চার ॥

প্রতাপকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে শক্ত সিংহ মোগল শিবিরে ফিরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হলেন।

সেলিম তাঁর বিচার করলেন, গুরুতর অপরাধ। বিশ্বাসঘাতকতা।

শুধু তাই নয়, তুই মোগল সৈন্যকে হত্যা। বিচারে সেলিম তাঁর প্রাণদণ্ড দিলেন। কাল সকালেই তাঁকে বধ করা হবে। আজ রাত্রে তিনি কারাগারে থাকবেন।

এই খবর শুনে দৌলত উন্নিসা মেহেরের কাছে বসে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তিনি শক্ত সিংহকে ভালবেসেছিলেন। গভীর অকৃত্রিম ভালবাসা।

মেহের উন্নিসা মুখে যত রঙ্গ-তামাসাই করুক, মনে মনে বুঝেছিলেন, তাঁর জন্যেই দৌলতের এই দশা। কারণ তিনিই দৌলতকে শক্ত সিংহের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কাঁদিসনি। আমি শক্ত সিংহকে বাঁচাবো। শুধু বাঁচাবো নয়, তোর সঙ্গে শক্ত সিংহের বিবাহ দেব।

দৌলত সেখান থেকে চলে গেলে, আপন মনে মেহের বললেন, দৌলত উন্নিসা, জানিস না বোন, আমার এই পরিহাসের নীচে কী আগুন চেপে রেখেছি। কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে দমন করব। নিজের সুখের জন্য নয়, অবোধ-অবলা মুগ্ধা বালিকা দৌলত উন্নিসার সুখের জন্য। সে যেন আমার প্রাণের কথা জানতে না পারে ভগবান, তাহলে বড় ব্যথা পাবে।

মেহের উন্নিসাও শক্ত সিংহকে ভালবেসেছিলেন। কারা-প্রহরীকে লক্ষ মুদ্রা দামের কণ্ঠহার উৎকোচ দিয়ে রাত্রির গভীর অন্ধকারে মেহের উন্নিসা শক্ত সিংহকে কারাগার থেকে বার করে আনলেন। তারপর দৌলতকে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, আমি জানি আপনারা পরস্পর পরস্পরকে খুবই পছন্দ করেন। দৌলত উন্নিসাকে আপনি বিবাহ করুন।

আশ্চর্য হয়ে শক্ত বললেন, বিবাহ! হিন্দু হয়ে যবনীকে বিবাহ! কোন্ শাস্ত্র অনুসারে?

মেহের বললেন, কেন, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে! আপনার পূর্বপুরুষ বাপ্পারাও যবনীকে বিবাহ করেননি ?

শক্ত বললেন, সে তো আসুরিক বিবাহ।

মেহের বললেন, হোক, আসুরিক, বিবাহ তো বটে! আর শাস্ত্র? শাস্ত্র কে গড়েছে শক্ত সিংহ? বিবাহের শাস্ত্র এক—সে শাস্ত্র 'ভালবাসা'।

শক্ত সিংহ সম্মত হলেন এবং দৌলতউন্নিসাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন।

মেহেরউন্নিসা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর আকবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কন্যাকে কঠিন তিরস্কার করলেন। সেলিমের মুখে তিনি সব খবর পেয়েছিলেন এবং মেহের যখন স্বীকার করলেন যে তিনিই উদ্যোগী হয়ে শক্ত সিংহকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দৌলতউন্নিসার বিবাহ দিয়েছেন তখন আকবরের রাগ যেন সপ্তমে উঠল।

মেহেরউন্নিসা বললেন, হিন্দুর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি তাতে এমন কি অন্যায় হয়েছে, আমার মা, তিনিও তো হিন্দু।

আকবর বললেন, সম্রাজ্ঞী হিন্দু, কিন্তু সম্রাট হিন্দু নয়! সে সাম্রাজ্ঞী আমার কে ?

মেহের উত্তর দিলেন, তিনি আপনার স্ত্রী!

অবজ্ঞা সহকারে আকবর বললেন, স্ত্রী! সে রকম আমার একশোটা আছে। স্ত্রী প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী—সম্মানের বস্তু নয়।

পিতার এই কথা শুনে মেহেরউন্নিসা মনে এমনই আঘাত পেলেন যে তিনি পিতার আশ্রয় ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘুরতে ঘুরতে মেহেরউন্নিসা শেষ পর্যন্ত এক বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেখানে তখন প্রতাপ সিংহ এক পার্বত্য গুহার মধ্যে সপরিবারে দিনযাপন করছেন।

মেহেরউন্নিসা প্রতাপের কাছে গেলেন এবং তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। শত্রু কন্যা জেনেও প্রতাপ সিংহ মেহেরকে আশ্রয় দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

এদিকে শক্ত সিংহ চুপ করে বসেছিলেন না। আগ্রা থেকে আসবার সময় পথে তিনি কিছু রাজপুত সৈন্য সংগ্রহ করে ফিনশরার দুর্গ জয় করে নিয়েছেন এবং গোপনে গোপনে আরও সৈন্য সংগ্রহ করছেন।

তিনি পরিকল্পনা করেছেন, আরও সৈন্য যোগাড় হবার পর তিনি দাদার কাছে যাবেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন।

কিন্তু প্রতাপ সিংহ অত্যন্ত ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যে। দিনের পর দিন তিনি সপরিবারে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, লোকবল নেই, অর্থ নেই, সামর্থ নেই। তাই তিনি স্থির করেছেন আর নয়। সম্রাট আকবরের বশ্যতা তিনি স্বীকার করবেন।

এমন সময় প্রতাপের কাছে এলেন শক্ত সিংহ। তিনি প্রতাপকে কিছুতেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করতে দেবেন না। বললেন, তিনি অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেছেন।

প্রতাপ বললেন, কিন্তু তাদের জন্যে তো টাকা চাই। টাকা পেলে সৈন্যদল গঠন করতে পারতাম।

মন্ত্রী ভীমসাহ জানালেন, তিনি টাকা দেবেন। যত টাকা লাগে দেবেন। পুরুষানুক্রমে রাণাদের কাছে চাকরি করে তাঁরা অনেক টাকা জমিয়েছেন, সেই সব টাকা তিনি প্রতাপের জন্য—দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দিতে প্রস্তুত।

প্রতাপ প্রথমে সে অর্থ নিতে চাইলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

সকলের অনুরোধে তিনি ভীম সাহেব কাছ থেকে টাকা নিয়ে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

চারিদিক প্রতাপের জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল। হাজারে হাজারে সৈন্য এসে জড় হল। চারণ দল পথে পথে গান গাইতে লাগল ঃ

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণ জয় গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িতধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারত মাতা।
কে বল করিবে প্রাণের মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া।
চল সমরে দিব জীবন ঢালি
জয় মা ভারত! জয় মা কালী।

॥ ছয় ॥

প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল।

মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ শক্ত সিংহের ঘাঁটি ফিনশারার দু্ আক্রমণ করলেন। সে আক্রমণ শক্তসিংহের সৈন্যরা প্রতিরো করতে পারল না। দুর্গের একদিকের পাঁচিল মোগলের কামানে গোলার আঘাতে ভেঙে পড়ল।

শক্ত সিংহ দেখলেন আর কোন উপায় নেই। তিনি যুদ্ধ কে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

এমন সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী দৌলত উন্নিসা। শক্ত সিংহ বললেন, তুমি এ সময়ে এখানে কেন?

দৌলত বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

বিরক্ত হয়ে শক্ত বললেন, মরতে! মোগল সৈন্য দুর্গ আক্রম করেছে, তারা এখনি এই দুর্গ দখল করবে। রাজপুত জাতের প্রথ

আছে, দুর্গ সমর্পণ করবার আগে প্রাণ সমর্পণ করে। তাই আমরা সসৈন্যে দুর্গের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করে মরব।

দৌলত বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

শক্ত বিদ্রূপ করে বললেন, তুমি যাবে? যুদ্ধক্ষেত্রে? যুদ্ধক্ষেত্র ঠিক প্রণয়ী যুগলের মিলনশয্যা না দৌলত! এ মৃত্যুর লীলভূমি।

দৌলত বললেন, আমিও মরতে জানি!

সত্য সত্যই দৌলত উন্নিসা, সেই ভীরু কোমল স্বভাবা দৌলত উন্নিসা, বর্ম চর্ম পরে বীরসাজে সজ্জিত হয়ে শক্ত সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই সময় শক্ত সিংহ দৌলত উন্নিসাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তোমাকে এতদিন চিনতে পারি নি। নিজেকেও চিনতে পারিনি। আজ বুঝতে পারছি আমি তোমায় সত্যই কত গভীর ভাবে ভাল বাসতাম!

কিন্তু মহাবৎ খাঁ শেষ পর্যন্ত সে দুর্গ দখল করতে পারলেন না। পিছন থেকে প্রতাপ সিংহের সৈন্যরা এসে তাঁকে আক্রমণ করল এবং তাঁর সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তাঁকে বন্দী করল।

পরদিন প্রতাপের শিবিরে আনন্দ কোলাহল চলেছে এমন সময় শক্ত সিংহ সেখানে এলেন।

প্রতাপ ভাইকে আলিঙ্গন করে বললেন, খুব সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম। আর একটু দেরী হলে তোমায় জীবিত পেতাম না।

ম্লান মুখে শক্ত বললেন, আমাকে রক্ষা করেছো বটে দাদা, কিন্তু এ যুদ্ধে আমি আমার সর্বস্ব হারিয়েছি!

প্রতাপ প্রশ্ন করলেন, কী হারিয়েছো শক্ত!

শক্ত বললেন, আমার স্ত্রী দৌলত উন্নিসাকে হারিয়েছি!

প্রতাপ যেন বজ্রাহত হলেন। শক্ত সিংহ মুসলমানী বিবাহ করেছিল। তিনি কেমন করে বরদাস্ত করবেন। সর্বস্ব পণ করে

তিনি এতদিন বংশগৌরব রক্ষা করে এসেছেন, সে গৌরব নষ্ট হতে দেবেন কি করে! না প্রাণ থাকতে তিনি তা পারবেন না। তার জন্য ভাই স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করতে হয় তাও তিনি করবেন।

তাঁর কথা শুনে সকলে তাঁকে অনুনয় করলেন কিন্তু প্রতাপ সিংহ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি শক্ত সিংহকে পরিত্যাগ করলেন।

॥ সাত ॥

মেহেরউন্নিসা চলে যাবার পর কন্যার শোকে সম্রাট আকবর অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লেন। নানা জায়গায় কন্যার সন্ধান করলেন কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পেলেন না।

যুদ্ধে হেরে গিয়ে মহাবৎ খাঁ আকবরের কাছে ফিরে এসে জানালেন যে তিনি বন্দী হয়েছিলেন বটে কিন্তু প্রতাপ সিংহ তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন এবং তিনি জেনে এসেছেন সম্রাট কন্যা মেহের উন্নিসা প্রতাপের আশ্রয়ে নিরাপদে আছেন।

এই খবর পেয়ে আকবর কন্যাকে পত্র পাঠালেন এবং সেই পত্রে অনেক অনুতাপ প্রকাশ করে কন্যাকে ফিরে আসবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালেন।

ফিরে এলেন মেহের। পিতার চরণপ্রান্তে পড়ে তাঁর মার্জনা চাইলেন, স্বীকার করেন তিনি নির্বোধের মতো কাজ করে দৌলত উন্নিসাকে হারিয়েছেন, শক্ত সিংহের সর্বনাশ করেছেন, রাণা প্রতাপের সর্বনাশ করেছেন।

আকবর কন্যাকে সস্নেহে উঠিয়ে নানা কথার মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, মেহের, রাণাপ্রতাপ সিংহ তোর প্রতি কোন অত্যাচার করেন নি তো?

মেহের উত্তর দিলেন, অত্যাচার, বাবা, তিনি এই অভাগিনীকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

সবিস্ময়ে আকবর বললেন, সে কি!

মেহের জানাল, একদিন রাণার পুত্র অমর সিংহ সুরাপান করে মেহেরের হাত ধরেন। রাণা তাই দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে গুলি করেন। রাণার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে সেই গুলিতে নিহত হন।

শুনে আকবর সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন. প্রতাপ সিংহ। এত মহৎ তুমি। তোমার সঙ্গে আমি আর যুদ্ধ করব না!

মেহের জানাল, রাণা প্রতাপ সিংহ সম্রাটের নামে একটি পত্র মেহেরের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন।

সাগ্রহে আকবর বললেন, কি লিখেছেন, পড় শুনি।

মেহের প্রতাপের পত্র পড়তে লাগলেন:

"প্রবল প্রতাপেষু,

দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আপনার ভাগিনেয়ী দৌলতউন্নিসা আর ইহজগতে নাই। ফিনশরার যুদ্ধে যোদ্ধৃবেশিনী দৌলতউন্নিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার যথারীতি সৎকার করাইয়াছি। দৌলতউন্নিসার বৃত্তান্ত যুদ্ধের পর সাহাজাদি মেহেরউন্নিসার মুখে শুনি। তাহার পূর্বেই মেবারের কুলকলংক শক্ত সিংহকে বর্জন করিয়াছি। শক্ত সিংহ আমার ভাই ছিল। এ যুদ্ধে সে ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু আজ আর শক্ত সিংহ আমার বা মেবারের কেহ নয়।

আমি আপনার যে শত্রু সেই শত্রুই রহিলাম। চিতোর উদ্ধার করিতে পারি বা না পারি, ভারত লুণ্ঠনকারী আকবরের হাতে শত্রুভাবে মরিবারই উচ্চাশা রাখি।

আপনি চাহিয়াছেন যে দৌলতউন্নিসার কলঙ্ক ও মেহেরউন্নিসার আচরণ যেন বহির্জগতে প্রকাশিত না হয়! তাহাই হউক—আমার দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবে না।

আমি যদি মেহেরউন্নিসাকে আপনার হস্তে প্রত্যর্পণ করি তাহা

হইলে আপনি আমাকে চিতোর দুর্গ অর্পণ করিতে চাহিয়াছেন। মেহেরউন্নিসা স্বেচ্ছায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করি নাই। তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অধিকার আমার নাই। তিনি স্বেচ্ছায় আসিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় যাইতেছেন। তাঁহাকে আমি বাধা দিবার কে? তাঁহার বিনিময়ে আমি চিতোর চাহি না। পারি তো বাহুবলে চিতোর উদ্ধার করিব। ইতি—

রাণা প্রতাপসিংহ।"

পত্রটি শুনে আকবর অভিভূত হলেন। তিনি সেইদিনই সভায় গিয়ে ঘোষণা করলেন যে রাণা প্রতাপসিংহের সঙ্গে তাঁর আর শত্রুতা নেই। তাঁদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চিরতরে বন্ধ হল।

দুর্ভাগিনী মেহেরউন্নিসার অন্তরের একটি বাসনা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হল, তিনি সম্রাট এবং রাণা এই দুই মহান নেতার মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

॥ আট ॥

প্রতাপ কর্তৃক তাঁর রাজ্য থেকে বহিস্কৃত হয়ে শক্ত সিংহ পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপকে রক্ষা করবার পর শক্ত সিংহ মোগল শিবিরে ফিরে গেলে সেলিম শুধু তাঁর বিচার করেননি—তাঁকে কটুকথা বলে পদাঘাত করেছিলেন। সেই অপমানের জ্বালা শক্ত সিংহ ভুলতে পারছিলেন না, প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন।

হঠাৎ সেই সুযোগ এলো। রাজা মানসিংহের ভগ্নীর সঙ্গে সেলিমের বিবাহ স্থির হয়েছিল। বিবাহের দিন সেলিম তাঞ্জামে চড়ে বিবাহ বাসরে চলেছেন এমন সময় ভীড়ের মধ্য থেকে এক পাগল ছুটে এসে তরবারি দিয়ে একজন তাঞ্জাম বাহককে আহত

করল। তাঞ্জাম থেমে গেল। তখন সেই পাগল তাঞ্জামে উঠে সেলিমকে পর পর মারল তিন লাথি, সঙ্গে সঙ্গে বললে, প্রথমটা আসল শোধ, আর দুটো হল সুদ! এই বলে তাঞ্জাম থেকে লাফিয়ে পড়ে সেই পাগল ধরা পড়বার আগেই কোমর থেকে পিস্তল বার করে গুলি মেরে নিজের মাথা উড়িয়ে দিল। পরে জানা গেল, সেই পাগল হচ্ছে রাণা প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ।

এদিকে তখন রাণা প্রতাপ মৃত্যুশয্যায়। কিছুদিন ধরেই তিনি কঠিন অসুখে ভুগছিলেন, আজ বৈদ্য এসে জানিয়ে গেছেন, শেষ সময় উপস্থিত।

গোবিন্দ সিংহ, ভীম সাহ, পৃথ্বিরাজ প্রভৃতি অনুগত অনুচরবৃন্দ রাণার শয্যার পাশে বসে আছেন। মাথার শিয়রে পুত্র অমরসিংহ।

কিছুক্ষণ পরে প্রতাপ চোখ মেলে চাইলেন, পুত্রকে কাছে ডেকে বললেন, মেবারের রাণা বংশের কুল মর্যাদা তোমার হাতে সঁপে গেলাম। তাকে রক্ষা কোরো!

তারপর গোবিন্দ সিংহের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার হাতেই এই পুত্রের ভার দিয়ে গেলাম। বলুন সে ভার আপনি গ্রহণ করলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি গোবিন্দ সিংহ চোখ মুছে বললেন, গ্রহণ করলাম রাণা।

পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মেবার সূর্যও অস্তমিত হল।

প্রফুল্ল

[মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে যে কয়টি নাটক কালজয়ী সৃষ্টি রূপে সমাদৃত, 'প্রফুল্ল' তার অন্যতম। এই সামাজিক নাটকে নাট্যকার তৎকালীন এক বাঙালী গৃহস্থ ঘরের যে চিত্র অংকিত করেছেন তা আজো মনকে আলোড়িত করে।]

॥ এক ॥

একটানা ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে দরিদ্র অবস্থা থেকে যোগেশ ঘোষ সততা ও কর্মোদ্দীপনার ফলে আপন সৌভাগ্য সৃষ্টি করে নিয়েছেন। বর্তমানে প্রৌঢ় বয়সে তিনি প্রভূত সম্পত্তির মালিক। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সুনাম সর্বত্র। জননী উমাসুন্দরী, স্ত্রী জ্ঞানদা, শিশুপুত্র যাদব, মেজ ভাই রমেশ, ছোট ভাই সুরেশ এবং মেজ ভ্রাতৃবধূ প্রফুল্ল—এই নিয়ে তাঁর সুখের সংসার—তাঁর সাজানো বাগান।

মার বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা। যোগেশ তার ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজেও কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করে আসবেন পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু তার আগে সম্পত্তি ভাগের দলিল করে যাবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। সেই উদ্দেশ্যে একটা লেখাপড়া করার জন্য তিনি মেজ ভাই রমেশকে ডেকে যথাযথ নির্দেশ দিলেন।

এমন সময় এক আকস্মিক দৈব বিপৎপাত উপস্থিত হল। বিশ্বস্ত পুরাতন কর্মচারী পীতাম্বর এসে জানাল, রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। সেই ব্যাঙ্কেই যোগেশের যথাসর্বস্ব ছিল।

এই আচম্‌কা আঘাত তিনি সামলাতে পারলেন না। ক্লান্তি দূর করবার জন্য তিনি সামান্য পরিমানে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন, এখন

"আবার ফকির হলুম" বলে মনের জ্বালা জুড়োতে সেই মন্তই অপরিমিত ভাবে পান করতে লাগলেন।

রমেশ ছিল যেমন কুচক্রী তেমনি স্বার্থপর। সে যখন শুনল যে দাদা বিষয়-সম্পত্তি তিন ভাগ করেছেন। তার এক ভাগ পাবে ছোট ভাই সুরেশ, তখন সে ছোট ভাইকে ঠকিয়ে তার বিষয় বাগাবার মতবল করল।

সুরেশ লেখাপড়া শেখেনি, আড্ডা দিয়ে বদ সঙ্গে মিশে বেড়াতো। রমেশ জানতো, কাঙালীচরণ এবং জগমণি নামে এক কুখ্যাত দম্পতির কাছে সুরেশ হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করে। তাই রমেশ সোজা কাঙালীচরণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কাঙালীকে বশ করবার সপক্ষে রমেশের হাতে একটি অমোঘ অস্ত্র ছিল।

কাঙালী ছিল ফেরারী আসামী। বর্তমানে হরিহর ডাক্তার নাম নিয়ে কলকাতায় ডিসপেন্সারি খুলে বসেছে। রাণাঘাটে যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে ফেরার হয়েছিল তার ভাইপো কাগজপত্র নিয়ে কাঙালী চরণের বিরুদ্ধে মামলা করবার উদ্দেশ্যেই রমেশেরই শরণাপন্ন হয়েছিল। ঐ কাগজপত্রই রমেশের হাতিয়ার। কাজেই রমেশের কথায় কাজ না করে কাঙালীচরণের উপায় ছিল না। কাঙালীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রমেশও তাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বিলম্ব করল না। 'সে কাঙালীকে বললে, যেভাবেই হোক, কোম্পানির কাগজে তারা যেন সুরেশের একটা স্বাক্ষর জোগাড় করে, অর্থাৎ তার বিষয়ের স্বত্বটা রমেশ নিয়ে নিতে চায়। কিন্তু সুরেশকে প্রতারিত করা সম্ভব হল না। নিজে বিপথগামী হলেও সুরেশের মনটা ছিল খাঁটি। আর সৎ ও "মহৎ দাদার" প্রতি তার ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তাই সে কাঙালী ও জগমনির প্রস্তাবে রাজী হল না।

কিন্তু তার তো ফুর্তি করবার জন্য টাকা চাই। কাঙালী তাকে

টাকা দিল না। তখন সুরেশ প্রফুল্লর কাছে এলো এবং দাদাকে ভাল করবার জন্য মাদুলী এনে দেবে বলে প্রফুল্লর কাছ থেকে মাকড়ি চেয়ে নিয়ে গেল—উদ্দেশ্য, সেটা বন্ধক দিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। কিন্তু মাকড়ি তো ফেরৎ পাওয়া চাই। তাই সে রমেশের নামে একখানা কাগজে লিখে রেখে গেল "মেজদাদা, মেজবৌদির মাকড়ি নিয়ে অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা দিয়েছি।" তার বিশ্বাস ছিল, সেই চিরকুট পড়ে রমেশ নিশ্চয়ই মাকড়ি ছাড়িয়ে আনবে। কিন্তু ঐ মাকড়ির সূত্র ধরেই রমেশ এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করল।

পরদিন যোগেশ মদের নেশা কেটে যাবার পর অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলেন, সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারদের টাকা শোধ করবেন। রমেশ সম্পত্তি জ্ঞানদার নামে বেনামী করার প্রস্তাব করতে যোগেশ বললেন, "লোকের কাছে জোচ্চোর হব! আমার সর্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড়গলা করে বলতে পারি কখনো প্রবঞ্চনার দিক দিয়ে চলিনি।" এই সময়ে রমেশ ময়রাদের ওলাওঠাগ্রস্ত ছেলেকে ব্রাণ্ডি দেবার অছিলায় মদের বোতলটি যোগেশের সামনে রেখে গেল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট: "বিষয়গুলো যে ব্যাপারি ব্যাটারা বেচে নেবে, তা প্রাণে সইছে না। দাদা যখন মদ ধরেছে সই করে নেবার কথা ভাবি না। আজই হোক, কালই হোক, মর্টগেজ সই করিয়ে নিচ্ছি। ভাবনা রেজেস্টির, তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়, জুড়ুতে দেওয়া হবে না, দাদাকে আজই মদ খাওয়াতে হবে। দাদাকেও ফাঁকী দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকানো চাই।"

রমেশের উদ্দেশ্য সফলও হল। সে চলে যাবার পর যাদব এসে খবর দিল, "বাবা, ছোট কাকাবাবু চোর হয়েছে, কাকীমার মাকড়ি নিয়ে গেছে।" বলা বাহুল্য এই ঘটনার মধ্যে রমেশের কারসাজি ছিল।

এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনে যোগেশ আবার ভেঙে পড়লেন। সামনেই

ছিল মদের বোতল। হতাশায় বেদনায় তিনি আবার মাত্রাতিরিক্ত মগুপান সুরু করলেন। এই সুযোগে রমেশ সাদা কাগজে যোগেশকে দিয়ে সই করিয়ে নিল। এমনি ভাবে মানী যোগেশের মৃত্যু হল, সৃষ্টি হল মাতাল যোগেশের।

॥ দুই ॥

দিন দুই পরে রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান একটি শুভসংবাদ নিয়ে যোগেশের সঙ্গে দেখা করতে এল। ব্যাঙ্ক সামলে উঠেছে এবং শিগগিরই মক্কেলদের টাকা দিতে আরম্ভ করবে। কিন্তু রমেশ দাদার অসুখ বলে তাকে কৌশলে ফিরিয়ে দিল এবং খবরটা চেপে গেল। তারপর মাকড়ি চুরির দায়ে সুরেশকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার জন্য সে কাঙালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল। আরও ষড়যন্ত্র করল যে যোগেশ-কর্তৃক আগেকার সইকরা মর্টগেজ সে কাউকে মুল্লুক চাঁদ ধুধুরিয়া নামে জাল মাড়োয়ারী সাজিয়ে তার নামে রেজেষ্ট্রি করে নেবে। এ বিষয়ে পীতাম্বরকে হাত করতে পারলে সুবিধা হতে পারে ভেবে সে পীতাম্বরকে ডেকে তাকে ভোলাবার প্রয়াস পেল। রমেশের কপট বাক্য বিন্যাসে সে চেষ্টা কার্যতঃ সফল হল। তারপর রমেশ কৌশলে জ্ঞানদাকে নিজের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করল। যোগেশকে দলিল রেজেষ্ট্রি করে দিতে রাজী করাবার জন্য সে জ্ঞানদাকে অনুরোধ করল। এই রকম না করলে নাকি বিষয় রক্ষা করা যাবে না, সকলকে পথের ভিখারী হোতে হবে— রমেশ জ্ঞানদাকে বোঝালে।

তারপর ইন্সপেক্টার হাবুল এসে জানালো, মাকড়ি চুরীর তদন্ত করতে গিয়ে সে জেনেছে, সুরেশ সেটা চুরী করেছে। তবে কিছু খরচপত্র করলে সে অন্যভাবে মামলা সাজিয়ে সুরেশকে চুরির দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারে। কিন্তু রমেশ তাতে রাজী হোতে

পারে না, কারণ তাহলে তো তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই কপট সাধু সেজে বললে, "আমি একজন নির্দোষীকে সাজা দেওয়াবো? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। লেট জাষ্টিস্ টেক ইটস্ কোর্স।"

হাবুল রমেশের কপটতা বুঝতে পারলো। সে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে-পাগলা বুড়ো মদন ঘোষকে নিয়ে বন্ধু শিবনাথের সঙ্গে সুরেশ কাঙালীচরণের বাড়ি এলো। তার সঙ্গে কয়েকজন খেমটাওয়ালীও এসেছে। মদন ঘোষের সঙ্গে কৌতুক করে তার বিয়ের আয়োজন করেছে সুরেশ। একজন খেমটাওয়ালীর সঙ্গে মদনের বিয়ে দেবে স্থির করেছে।

নানা কৌতুক কাণ্ড চলেছে এমন সময়ে পুলিশ এসে সুরেশ ও শিবনাথকে ধরল। সুরেশ ইচ্ছা করলেই সত্য ঘটনা বলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতো, অর্থাৎ সে বলতে পারতো, মাকড়ি সে চুরি করেনি, তার মেজবৌদি তাকে স্বেচ্ছায় দিয়েছে। কিন্তু তাতে কুলবধুর অপমান হবে, প্রফুল্লকে কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে, সেকথা ভেবে সে দোষ কবুল করল। কেবল তাই নয় কাঙালী যখন মিথ্যা করে নোটচুরীর অজুহাতে শিবনাথকে ধরিয়ে দিতে চাইল তখন সুরেশ সেই মিথ্যা চুরির দায়িত্বও নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে বন্ধুকে বাঁচালো।

বিচারে সুরেশের পনর দিন সশ্রম কারাদণ্ড হল।

॥ তিন ॥

সুরেশকে জেলে পাঠাবার পর রমেশ সম্পত্তির দখল নেবার উদ্যোগ করল। পীতাম্বর পথের অন্তরায় বলে তাকে ঘুষ দিয়ে বশীভূত করবার জন্য কাঙালীকে সে পীতাম্বরের কাছে পাঠাল। কিন্তু রমেশের উদ্দেশ্য সফল হল না।

তারপর জানা গেল, রমেশ তার মক্কেলের পক্ষে যোগেশের বাড়ি দখল করেছে এবং যোগেশকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় নি।

এরপর রমেশ জেলে গিয়ে সুরেশের সঙ্গে দেখা করল। আপীল করে সুরেশকে জেল থেকে খালাস করে নিয়ে যাবে রমেশ, সেজন্য টাকার প্রয়োজন, কিন্তু সুরেশ সই না করলে তার বখরা বাঁধা রেখে টাকা তোলা যাবে না।

এই মিথ্যায় ভুলিয়ে সুরেশকে দিয়ে একটা দলিলে সই করিয়ে নেবার জন্য রমেশ কাঙালীচরণকে নিয়ে জেলে সুরেশের সঙ্গে দেখা করল। সাক্ষী হিসাবে কাঙালীচরণকে দেখে সুরেশের মনে সন্দেহ জাগল, সে সই করতে চাইল না। কাগজ ছিঁড়ে ফেললো।

দিন পাঁচেক পরে। যোগেশ উমাসুন্দরী:কে নিয়ে সপরিবারে জ্ঞানদার বাড়ি উঠে এসেছেন। সুরেশের যে জেল হয়েছে তা উমাসুন্দরী জানতেন না। সেদিন পীতাম্বরের কাছে জানা গেল, সম্ভবতঃ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

পীতাম্বর যোগেশকে নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবার জন্য বেরুলো, কারণ একখানা চেকবই আনতে হবে। যোগেশ রমেশের নামে যে টাকা জমা দেবার অ্যাডভাইস ব্যাঙ্কে দিয়েছিলেন সেটা খারিজ করতে হবে এবং সুরেশকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য টাকা তুলতে হবে। রাস্তায় গড়াণহাটার মোড়ে পড়ল শুঁড়ীর দোকান। কাছাকাছি ব্যাপারিদের দেখে যোগেশ পীতাম্বরকে গাড়ী আনবার জন্য পাঠালেন, কারণ তাদের সামনে দিয়ে পায়ে হেঁটে তিনি যাবেন! পীতাম্বর চলে যাবার পর যোগেশ ব্যাপারিদের সামনে পড়ে গেলেন। তারা যোগেশকে জোচ্চোর বলে গালাগালি দিলে। ক্ষোভে দুঃখে যোগেশ ভাবলেন ফিরে যাবেন। ইতিমধ্যে একজন নীচজাতীয় স্ত্রীলোক এসে নেশার ঘোরে যোগেশকে জোচ্চোর বলল। এরপর যোগেশ যেন আত্মবিস্মৃত হলেন, সবাই তাঁকে জোচ্চোর বলছে। তবে আর কিসের লজ্জা!

এইরূপ মন নিয়ে তিনি শুঁড়ীর দোকানে ঢুকে আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন এবং রাস্তায় এসে মাতালদের সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পীতাম্বর তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল।

পরদিন কৌশল করে জগমনি এসে উমাসুন্দরীকে জানিয়ে গেল যে সুরেশের জেল হয়েছে। এই মর্মান্তিক খবর শুনে উমাসুন্দরী পাগল হয়ে গেলেন।

যোগেশ বদ্ধ মাতালে পরিণত হলেন। মত্ততার ঘোরে তিনি ইঁট ছুঁড়ে পীতাম্বরের মাথা ফাটিয়ে দিলেন।

॥ চার ॥

তিন মাস পরের ঘটনা।

সুরেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং শিবনাথের বাড়িতে আছে। জেলে মেটের প্রহারের দরুণ সুরেশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলিছিল এবং তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। অতঃপর তাকে জেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। তারপর খালাসের দিন শিবনাথ গিয়ে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে এবং সেবা শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলেছে।

শিবনাথের কথায় জানা গেল, জ্ঞানদা বাড়ি বিক্রি করে কোথায় চলে গিয়েছে, বহু অনুসন্ধানেও তা জানা যায় নি। যোগেশ এখন বদ্ধ মাতাল অবস্থায় পথে পথে মাতালদের সঙ্গে মদ খেয়ে বেড়াচ্ছেন। পীতাম্বর অসুস্থ অবস্থায় দেশে আছে, তবে পত্র দিয়েছে একটু সুস্থ হলেই সে আসবে।

সুরেশকে দেখতে যে ডাক্তার এলো, সে জানালো যে সে রমেশ ও কাঙালী দু'জনকেই মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে যে সুরেশের মৃত্যু হয়েছে।

দিন দুই পরেই জানা গেল পীতাম্বরকে কৌশলে ফৌজদারী মামলায় গ্রেপ্তার করানো হয়েছে এবং সেই বিয়ে-পাগলা বুড়ো মদন ঘোষ

কাঙালীর কথায় বশীভূত হয়ে জ্ঞানদাকে ফাঁকী দিয়ে তার সিন্দুক ভেঙে বাড়ির দলিল চুরি করে এনেছে।

মুল্লুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজবে কে? কাঙালী বললে, ভজহরি নামে এক বখাটে ভাগনে আছে সে এ কাজে খুব উপযুক্ত। কাঙালীর বাড়িতে রমেশ ভজহরিকে ডেকে তার করণীয় কি তা বুঝিয়ে দিলে।

ইতিমধ্যে জ্ঞানদা এক বস্তী বাড়িতে উঠে এসেছে। যোগেশ সেখানে গিয়েও মদ খাবার জন্য জ্ঞানদার কাছে পয়সা চাইলেন। যোগেশের এখন আর কোন লজ্জা সরম নেই। ভিক্ষা করেও তিনি মদ খান। কয়েকদিন আগে তিনি জ্ঞানদার বাড়িবেচা তিনশো টাকা চুরি করে মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এবার জ্ঞানদা যখন টাকা দিতে রাজী হল না তখন যোগেশ জ্ঞানদাকে লাথি মেরে টাকার বাক্স নিয়ে চলে গেলেন। সামান্য টাকা—মাত্র তিনটি—তাও বাসন বাঁধা দিয়ে জ্ঞানদা জোগাড় করেছিল।

যোগেশ চলে যাবার পর বাড়ীওয়ালা এসে জ্ঞানদাকে দশ কথা শুনিয়ে দিল। "ভাড়া যদি দিতে না পারো এখনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।" অগত্যা জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরে বস্তীবাড়ি ছেড়ে পথে দাঁড়ালো।

এ দিকে প্রফুল্ল জানতে পারলো যে রমেশ ও জগমণি যাদবকে ধরে এনে তাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে।

যোগেশকে দেখা গেল রাস্তায় ঘুরছেন। তারপর শিবনাথের সঙ্গে ভজহরির দেখা হল। ভজহরি তাকে রমেশের ষড়যন্ত্রের কথা জানালো।

সেই দিনই রাস্তায় জ্ঞানদার মৃত্যু হল। যোগেশ সেখানে উপস্থিত হয়ে জ্ঞানদার মৃত্যু দেখলেন, তারপর বুকফাটা হাহাকার করে উঠলেন—"আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

॥ পাঁচ ॥

রমেশ মনে মনে খুব উৎফুল্ল : "বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল করে জিজ্ঞাসা করলেম। এখন ছেলেটা কোথায় গেল। সেটাকে ধরতে পারলেই যে আপদ চোকে।"

তারপর জগমণির প্ররোচনায় মদন ঘোষ যাদবকে ধরে নিয়ে এলো। এবং রমেশেরই বাড়ির একটা গোপন মহলে তাকে বন্ধ করে রাখা হল। উদ্দেশ্য—ঔষধ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করা হবে।

সেইদিন সন্ধ্যায় জ্ঞানদার মৃতদেহ সৎকার করবার জন্য সুরেশ শ্মশান ঘাটে এসেছে। সঙ্গে শিবনাথ ও ভজহরি।

যাদবকে খুঁজে বার করবার জন্য সুরেশ লোক লাগিয়েছিল। সে এসে খবর দিলে, একজন ময়রা বলছে, একটি ছেলে খাবার কিনতে এসেছিল, এক বুড়ো এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে।

এ থেকে ভজহরি আন্দাজ করল, সেই বুড়ো আর কেউ নয়, মদন ঘোষ, তার মামীর অনুচর।

ইতিমধ্যে রমেশ সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে আলাপ করে ভজহরি বুঝলো, যাদব রমেশের বাড়িতেই আছে। সুরেশ বেঁচে আছে জেনে হতাশক্ষুব্ধ রমেশ সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। ভজহরি শিবনাথ ও সুরেশকে নিয়ে রমেশের বাড়ির দিকে রওনা হল।

সকলে চলে যাবার পর শ্মশান ঘাটে এলেন যোগেশ! তাঁর মুখে সেই হাহাকার—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

এদিকে প্রফুল্লর কথায় মদন ঘোষের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল, তার শুভবুদ্ধির উদয় হল। সে যাদবকে বাঁচাবার জন্য প্রফুল্লকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় যাদবকে মেরে ফেলবার জন্য আয়োজন করল রমেশ কাঙালী ও জগমণি।

যাদবকে বিষ খাওয়ানো হল।

যাদব বুঝতে পেরেছে যে তার মৃত্যু আসন্ন। সে জল খেতে চাইল। কিন্তু জগমণি তাকে জল দিল না।

এমন সময় প্রফুল্ল এসে যাদবকে জল দিল এবং তাকে কোলে করে বসল। মদন ঘোষও এসে পড়ল, বললে, আমি আর কাউকে ভয় করি না। ধর্মরাজ রক্ষা কর। আমি এই ওষুধ এনেছি, খাইয়ে দাও। যাদব ভাল হয়ে উঠবে।

রমেশ প্রফুল্লকে চলে যেতে বললে। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই যাদবকে ছেড়ে চলে গেল না। তখন হিংস্র ক্ষিপ্ত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রমেশ প্রফুল্লর গলা টিপে ধরে তাকে হত্যা করল।

এমন সময় সুরেশ, শিবনাথ ও ভজহরি পুলিশ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হল এবং রমেশ, কাঙালী ও জগমণিকে গ্রেপ্তার করা হল।

উমাসুন্দরী এলেন। তিনি বদ্ধ উন্মাদ। বিলাপ করতে করতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সর্বশেষে এলেন যোগেশ, অর্ধ-উন্মাদ, চোখের দৃষ্টিতে বিহ্বলতা। চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে আমার বাড়ীতেই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ। দেখছো, দেখ, মরবার সময়ও দেখবে। দেখ, দেখ। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আহা হা! আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।"

শেষের কবিতা

[রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিরূপে গণ্য করা হয়। শেষের কবিতা রচনার একটি সাহিত্যিক পটভূমি আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এ দেশের সাহিত্যে একটা নতুনত্বের আমদানি হয়েছিল। চিরাগত সংস্কারকে উপেক্ষা করা, নরনারীর যৌন সম্পর্কের নতুন মূল্যায়ন এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় তার প্রকাশ—এই সব ছিল সেই নতুনত্বের লক্ষণ। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, কেতকী প্রভৃতি পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ছিলেন এই নতুনত্বের উপাসক। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ভাষায়, "ভাব-বিদ্রোহী তরুণের দল সেদিন নতুন দৃষ্টি নিয়ে নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেদিনের সেই আন্দোলন সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। সে যেন বঙ্কিম—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্রের বাণীমন্দিরের পাশে আর এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার স্পর্ধিত উৎসব।"

প্রায় সত্তর বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মানসও যে ঐ সব তরুণ গোষ্ঠীর চেয়ে কম তরুণ নয় তা দেখাবার জন্যই যেন 'শেষের কবিতা' একটা প্রকাণ্ড চ্যালেঞ্জ। সেই উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবেশিত হল।]

॥ এক ॥

শিলং পাহাড়ের পথে হঠাৎ এক মোটর দুর্ঘটনা।

একটি মোটর গাড়ী সামনে আসা আর একটি মোটরকে ধাক্কা দিল।

যে-গাড়িটি এগিয়ে যাচ্ছিল তার চালকের নাম অমিত রায়। অমিত রায় ছিল প্রকাণ্ড স্টাইলিষ্ট এবং এক অদ্ভুত ধরণের কবি।

অপর গাড়ীর আরোহিনী ছিল একটি মেয়ে। তার নাম লাবণ্য।

মোটর-সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে হু'জনের আলাপ।

কিন্তু তার আগের পর্ব এবং সে-পর্বের কাহিনী জেনে নেওয়া দরকার।

এই কাহিনীর প্রথম পর্ব সূচিত হয় অকসফোর্ডে—সাত বছর আগে। সেখানে কেটি মিত্তির নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অমিতের আলাপ হয়। এবং একদিন জুন মাসের এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে সমস্ত আকাশ যখন আনন্দমুখর, মাঠে মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে ধরণীর সৌন্দর্য যখন উপচে পড়ছে, সেই পরম ক্ষণটিতে অমিত কেটির হাত খানি ধরে তার হাতে তুলে নিয়ে তার আঙুলে প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিল।

ভাবাবেগে চালিত অমিত সেদিন একবারের জন্যও ভাবে নি যে এই ভাবে এক তরুণীর কাছে ধৈর্য হারিয়ে অনুরাগ প্রকাশ করার মধ্যে এবং আংটি পরানোর মধ্যে কোন দায় আছে, কোন বন্ধন আছে। তাই জ্যোৎস্না যখন মিলিয়ে গেল, প্রকৃতির প্রগল্‌ভ পুষ্পিত প্রলাপ যখন নীরব হল তখন সেই আংটি পরানোর ব্যাপারটা অমিত ভুলে গেল।

অমিত চিরজীবন কেবল উপস্থিত বর্তমানটাকেই দেয়। তাই তার কাছে আংটি পরানোর মুহূর্তটাই ছিল সত্য। তার পরেও সেই মুহূর্তটিকে যে মনে রাখতে হবে—সে ধাতের মানুষ সে ছিল না। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাড়াটাই তার স্বভাব।

কিন্তু আঠারো বছরের কেটি বা কেতকী ছিল অন্য ধাতের। সেই আংটি পরানোর মুহূর্তটি তার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। অমিতের দেওয়া আংটি সে এক মুহূর্তের জন্যও খোলে নি।

কিন্তু অমিত তাকে ভুললো এবং তারই অনিবার্য ফল স্বরূপ কেতকীর হৃদয় মরে গেল, কাজেই তার মূর্তির বদল হোতে দেরী হল না।

অমিতের ব্যবহারে তার মনের ক্ষোভ ও বেদনা মানুষের প্রতি সহজ বিশ্বাসের উপর নিষ্ঠুর আঘাত হেনে তার মনটাকে মুচড়ে দিল। কেতকী মিত্র রূপান্তরিত হল কেটি মিটার-এ। "অত্যুগ্র বিলিতি কৌলিন্য কেতকী মিত্রের সহজাত সংস্কার বা প্রবৃত্তি নয়। তাহার বিকল কামনা-প্রসূত একটা বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসারই রূপান্তর। ...কেটি মিটার কেতকী মিত্রের কৃচ্ছ্রসাধনের রূপ, নিষ্ঠুর বেদনার রূপ, জীবনকে ব্যঙ্গ করবার রূপ।"

॥ দুই ॥

লাবণ্যের জীবনের পূর্ব ইতিহাসটা এই রকমঃ সে ছিল এক ধনী অধ্যাপকে একমাত্র কন্যা। তার বাবা তাকে এমন ভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন যে, তাতে করে তার মনের আর সকল দরজার দিকে নজর দেবার অবসরই তার আর হয়নি।

সেই অধ্যাপকেরই এক ছাত্র ছিল শোভনলাল। সে মুগ্ধ পূজারীর মতো সকলের অগোচরে লাবণ্যকে ভালবাসতো। সে লাবণ্যের একটি ছবি আঁকিয়ে তাকে ফুল দিয়ে ঢেকে নিজের গোপন হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার সেই গোপন পূজা ধরা পড়ে গেল এবং লাবণ্য তাকে কঠোর তিরস্কার করে তাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিলে।

লাবণ্যের মধ্যে ছিল একটা প্রচ্ছন্ন অহংকার এবং উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সে শোভনলালের হৃদয়কে বোঝবার চেষ্টা করেনি।

তারপরের পর্বে অমিত ও লাবণ্যের পরিচয় ঘটল শিলং পাহাড়ে।

এতোদিন পর্যন্ত লাবণ্যের জীবন ছিল অস্বাভাবিক। তার সমস্ত সময়টা ছিল রুটিন-বাঁধা কাজের চাপে ঠাসা। এমনি সময়ে হঠাৎ যেন সে জেগে উঠল—অমিতের সঙ্গে পরিচয় হোয়ে।

আর অমিতও লাবণ্যকে দেখে মুগ্ধ হল। স্থান কাল পরিবেশে

মেয়েটি অনির্বচনীয় বলেই তার কাছে প্রতিভাত হল। অমিত তাদের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু কোনদিন তার মনে কোন দাগ পড়ে নি। কিন্তু সেদিন পর্বত চূড়ায় গোধুলি লগ্নের সেই পরমক্ষণে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের মধ্যে একটা গ্রন্থি রচিত হল।

॥ তিন ॥

লাবণ্যকে ভালবাসার পর অমিতের প্রাণে—অমৃতের বন্যা রয়েছে। সে লাবণ্যকে বলেছে—"তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছো বন্যা! সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুর বাঁধা পড়ল। তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছো', এ যে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারিনে।'

প্রেমের উন্মেষে অমিত নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আর, অমিতের সংস্পর্শে এসে অমিতের ভালবাসা, তার উদ্দাম প্রাণশক্তি ও আবেগ লক্ষ্য করে লাবণ্যের জীবনেও এসেছে এক নতুন অধ্যায়।

যোগমায়া দেবী ছিলেন লাবণ্যের অভিভাবিকা।

লাবণ্যের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অমিত নিজেই তার বিয়ের ঘটকালি করেছে যোগমায়া দেবীর কাছে। যোগমায়া সম্মতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু অমিত যে রকম অস্থিরমতি, তাতে তাকে দেখে যোগমায়ার মনে সন্দেহ জেগেছে যে বিয়ের পর লাবণ্যের প্রতি অমিতের আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা। তাই তিনি তাকে বলেছেন—'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হোয়ে না দাঁড়ায়।"

লাবণ্যের মনেও যে এই রকম একটা সন্দেহ জাগেনি, তা নয়। যে ব্যক্তি নিয়ত চঞ্চল, যে অতীতের ভাবনা ভাবে না, ভবিষ্যতের

ধার ধারে না, যে-ব্যক্তি চেনে শুধু বর্তমান মুহূর্তটাকেই, ঘরের বন্ধন সে কি মেনে নিতে পারবে ?

লাবণ্য সম্বন্ধে অমিতের আবেগাপ্লুত বন্দনা শুনেও তাই লাবণ্য তার বিচার শক্তি হারায় নি।

॥ চার ॥

সেদিন দুপুর বেলা খাওয়ার পর থেকেই লাবণ্য অধীরা—অমিতের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা—কখন আসবে অমিত। সেদিন দুর্দান্ত বৃষ্টি নেমেছে। এমন দিনে মিলন-ব্যাকুলতা স্বভাবতই জাগে।

"লাবণ্যের মনে একটা ইচ্ছা আজ অশান্ত হোয়ে উঠলো—যাক সব বাধা ভেঙ্গে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতের দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে জন্মান্তরে আমি তোমার।"

অমিতের জন্য অধীর প্রত্যাশায় সময় কাটছিল লাবণ্যের। কিন্তু সময় চলে গেল, অতিথি এলো না। একটা গভীর অবসাদে লাবণ্য যেন ভেঙে পড়ল।

এর কিছু পরেই তার ঘরে এলেন যোগমায়া। বললেন, "সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালবাসো।"

তার উত্তরে সমস্ত সংশয় কাটিয়ে লাবণ্য বললে—"আমার ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তা-মা। আমি তো ভেবে পাইনে, আমার চেয়ে ভালবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে? ভালবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই।"

অতঃপর দু'জনে গিয়েছেন অমিতের বাসায়।

লাবণ্যকে অমিতের পাশে দাঁড় করিয়ে যোগমায়া লাবণ্যের ডান

হাত অমিতের ডান হাতে রেখে, লাবণ্যের গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দু'জনের হাত বেঁধে বলেছেন—"তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।"

অমিত ও লাবণ্য দুজনে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়েছে।

ঠিক হল আগামী অঘ্রাণ মাসে অমিত লাবণ্যের বিয়ে হবে।

॥ পাঁচ ॥

কিন্তু তারপর নানা কথায় মধ্য দিয়ে মিলনের স্বপ্নে যেন ফাটল ধরল।

মিলনের অব্যবহিত পূর্বে শেষ কথাটি কবিতায় বলতে গিয়ে লাবণ্য যা আবৃত্তি করলে তাতে যেন বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হল—

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা।..."

কবিতাটি শুনে অমিত চমকে উঠেছে! এ কী বলতে চায় লাবণ্য!

এর পর অমিতের কথায় ও কবিতায় প্রেমের মধুর স্বপ্ন ভেঙে যাবার আশংকাও যেন ফুটে উঠল।

বহুদিন পরে বিস্মৃতপ্রায় শোভনলালের প্রসঙ্গও উঠল এবং সে প্রসঙ্গ যেন ব্যাধের শরের মত প্রণয়ী যুগলকে অলক্ষ্যে থেকে বিদ্ধ করল—তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করল।

তারপর অমিত-লাবণ্যর প্রেমস্বপ্ন ভঙ্গ করবার জন্যই যেন ধূমকেতুর মত কলকাতা থেকে অমিতের বোন সিসি আর সিসির বন্ধু কেতকী

বা কেটি মিত্তির এবং তার ভাই নরেন মিটার শিলঙে এসে হাজির হল।

তাদের আবির্ভাব অমিত-লাবণ্যের বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করল।

অমিত তার বোন আর কেতকীদের কাছে লাবণ্যের প্রতি তার প্রেমের নির্ভীক স্বীকারোক্তি করতে পারলো না। একটা কুণ্ঠিত আত্মগোপন প্রচেষ্টা তার মধ্যে প্রকট হল।

অমিত যে লাবণ্যকে নিয়ে তার বোন আর বান্ধবী প্রভৃতির কাছে লজ্জিত, লাবণ্য তা বুঝল। সিসি, কেটির ব্যবহারে, তাদের প্রকাশ্য আক্রমণে ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে লাবণ্য ব্যথিত ও অপমানিত বোধ করল। এর ফল হল, লাবণ্য অমিতকে বিবাহ করবার ইচ্ছা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল।

কেটি সুদীর্ঘ আট বছর অমিতের সঙ্গে মিলনের আশায় ও অপেক্ষায় ছিল। তাই যখন অমিত সিসিকে বললে যে, লাবণ্যের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছে অঘ্রাণ মাসে, তখন কেটি চমকে উঠলেও হেসে বললে—"আই কন্‌গ্রাচুলেট।"

কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হল।

অমিত একদিন তার হাতে যে হীরের আংটি পরিয়ে দিয়েছিল সেই আংটি দেখিয়ে অমিতকে সে বললে—"এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্তও হাত থেকে খুলিনি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমারই হার হল। সেদিন এত আদরের আংটি দিয়েছিলে কেন? সে দেওয়ার মধ্যে কি কোন বাঁধন ছিল না? সেই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান তুমি কোনদিন ঘটতে দেবে না?"

অমিত এই কথার উত্তরে কি বলবে ভেবে পেল না।

কেতকী বললে—"এই আংটি আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যা কথা বলতে দেব না।"

এই বলে আংটি খুলে অমিতের সামনে টেবিলের উপর রেখে কেতকী দ্রুত পায়ে চলে গেল। তার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কেতকীর মধ্যে যে সত্যিকারের প্রেম ছিল তার সন্ধান পেয়ে লাবণ্য অমিতকে বলল—"একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছিনে, আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিও না। আমার কোন চিহ্ন রাখবার দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

এই কথার পর অমিতের দেওয়া আংটিটি নিজের হাত থেকে খুলে সে অমিতের হাতে পরিয়ে দিলে।

লাবণ্য ও অমিতের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল।

॥ ছয় ॥

এই ঘটনার পর লাবণ্যের মন শোভনলালের চিন্তায় আচ্ছন্ন হল। শোভনলালের প্রতি তার আকর্ষণ অকস্মাৎ প্রবল হোয়ে উঠল।

শোভনলালের একটি চিঠি সে পেয়েছে এবং তাতে মনে অনুশোচনা জেগেছে, একদিন নিষ্ঠুর ভাবে শোভনলালকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

শেষ পর্যন্ত যে ভালবাসাকে একদিন সে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই ভালবাসাই আজ তাকে জয় করল। শোভনলালের ভালবাসার মাহাত্ম্যে লাবণ্য মুগ্ধ হল। সুদীর্ঘকাল উৎকণ্ঠিত চিত্তে যে প্রেমিকটি লাবণ্যের প্রতীক্ষা করেছে তার প্রেমের গভীরতা ও শক্তি লাবণ্য বুঝলো। যে-প্রেমিক ভালোমন্দ মিশিয়ে অসীম ক্ষমায় তাকে দেখে, তারই কাছে শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে উৎসর্গ করল।

অমিত ভালবেসেছিল লাবণ্যকে, বিবাহ করল কেতকীকে।

লাবণ্য ভালবেসেছিল অমিতকে, বিবাহ করল শোভনলালকে। অমিতের কাছ থেকে সে ভালবাসার যে আস্বাদ পেয়েছিল তাতে তার নারীসত্তা জেগে উঠেছিল—আসল প্রণয়ীকে সে চিনতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত।

কাহিনীর শেষে লাবণ্য অমিতকে বলেছিল—"তোমারে যে দিয়েছিনু সে তোমারই দান, গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়।"

আর অমিত বলেছিল—"একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম ওড়ার আকাশ। আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি—কিন্তু আমার আকাশও রইল—আমি রোমান্সের পরমহংস ভালোবাসায় সত্যকে আমি একই সঙ্গে জলে স্থলে উপলব্ধি করব। আবার আকাশেও। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই। কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালবাসা, সে রইল দীঘি, সে ঘরে আসবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।